সাক্ষরতা বুলেটিন

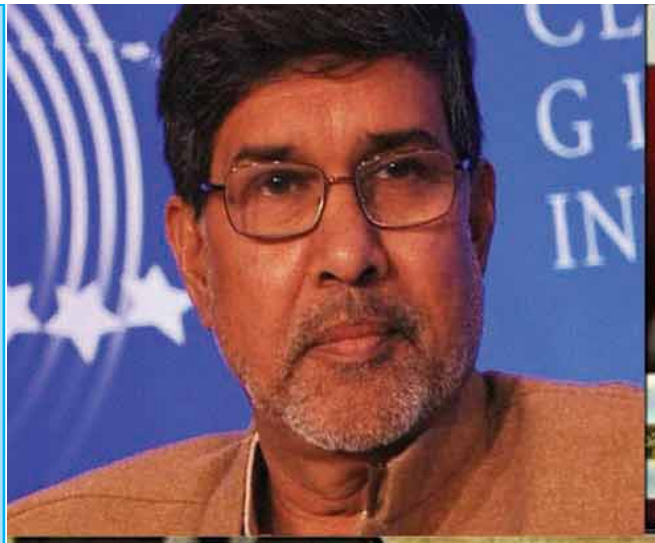

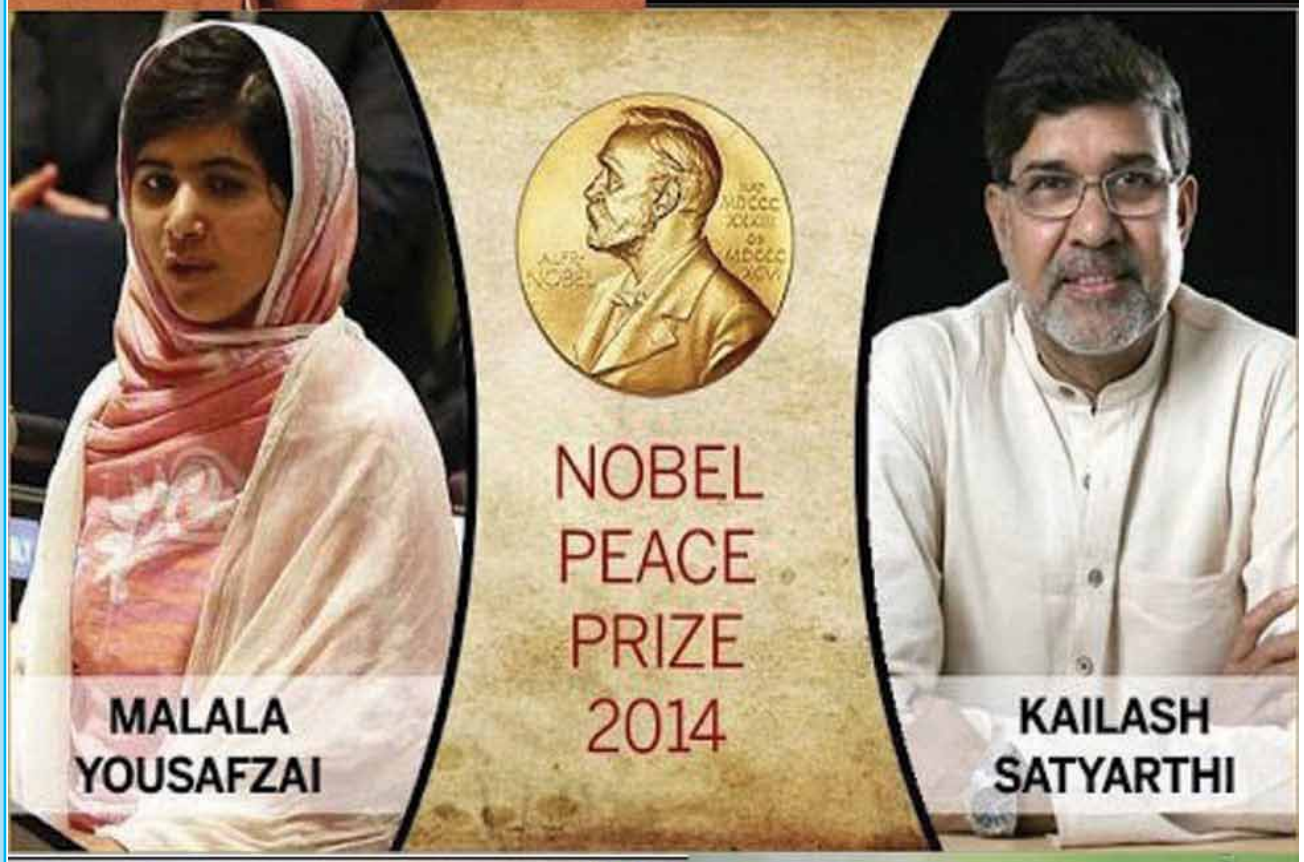

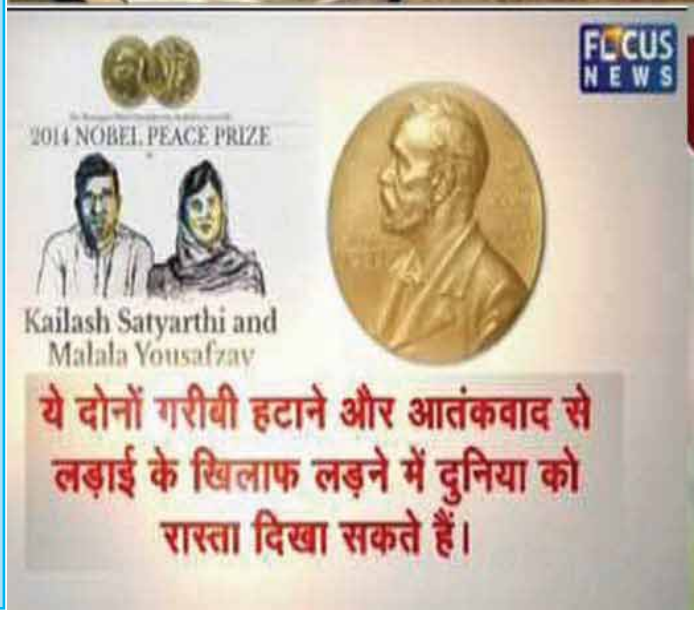

২৪৫

কার্তিক ১৪২১
অক্টোবর ২০১৪

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৪৫ কার্তিক ১৪২১ অক্টোবর ২০১৪

সূ চি প ত্র

৩ **ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ**
শিক্ষায় বিনিয়োগ: বিনিয়োগকৃত শিক্ষা

৫ **আহাদ হায়দার**
টেকসই উন্নয়নের মূলকথা সাক্ষরতা আর দক্ষতা

৯ **ফারদানা আলম সোমা**
শান্তিতে ভারত-পাকিস্তানের নোবেল বিজয়

১১ **মাহমুদুল হক**
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং জনশক্তি

১৬ **সামন্ত ভদ্র**
শিক্ষার অভিব্যক্তি

১৯ **ফজলুল হক**
টেকসই উন্নয়নের মূলকথা সাক্ষরতা আর দক্ষতা

২৩ **শফি আহমেদ**
শেকস্পীয়রের ছোঁয়া

২৭ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

শিক্ষায় বিনিয়োগ: বিনিয়োগকৃত শিক্ষা

শিক্ষা মানুষকে চক্ষুষ্মান করে, শিক্ষায় মানুষের মাঝে ঘুমিয়ে থাকা শক্তি সুপ্ত অবস্থা থেকে জেগে ওঠে। শিক্ষা মানুষের দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করে, তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ, সবাক ও স্বকর্ম করে তোলে। মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার যেমন বিকল্প নেই, জাতীয় জীবনমানের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষায় বিনিয়োগেরও তেমন বিকল্প নেই। তবে কেমন বিনিয়োগ, কতটা বিনিয়োগ, বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ও উদ্‌যাপনের উপায় কি এ বিষয়গুলি পর্যালোচনায় আনা বা আসার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'। এটি কি মহাজন-বাক্য হিসেবে উচ্চারণেই শুধু সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে? এ উপলব্ধি কি শুধু শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে পরীক্ষার খাতায় রচনা লেখার জন্য, বিজ্ঞজন ও নীতি নির্ধারকদের বাণীর মধ্যে উল্লেখেই তার সমাপেন ভবেৎ? রবীন্দ্রনাথসহ বহু ভাবুক, দার্শনিক ও দিগবেত্তারা একথা বলেছেন বার বার, আমরা কথার ফুলঝুড়িতে, বলা বাহুল্য বাগাড়ম্বরের মধ্যে বসবাস করি, ভেতরে প্রবেশের তাগিদ বোধ করি না। জাতির মেরুদণ্ড খাঁড়া করা কিংবা রাখার দায়িত্ব কার? শিক্ষার বাজেট বা বরাদ্দ বা বিনিয়োগ বিষয়ক সংখ্যার হিসেব-নিকেশ নিয়ে যত তর্ক-বিতর্ক এবং এতদ্‌সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া পেশের মধ্যে যে সময় ও শ্রম ব্যয় হয়, এর পর যতটুকু বরাদ্দ মেলে সেই অর্থ যথাকাজে, যথাউপায় অবলম্বন করে, যথাফল লাভের পথ ধরে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারটা ততটা আমলে আসে না।

একটি বৃক্ষকে সত্যই সবল ও সুস্থ হয়ে বড় বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে হলে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকৃত পরিচর্যা প্রয়োজন। এ সময়টা দেখ ভালের প্রয়োজনীয়তা এজন্য জরুরী ও আবশ্যক এজন্য যে এ পর্যায়ে কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত হলে পরবর্তী পর্যায় তথা অপরাপর অংশে সংক্রমণের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠবে এবং একসময় গোটা গাছটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা পরীক্ষা-ব্যবস্থাকে মূল্যায়নমুখী করছি না, তা হয়ে উঠেছে পাশ বা গ্রেড-নির্ভর; আর এর পরিসংখ্যান পরিব্যপ্তির প্রাগ্রসরমানতা দেখে পরিতৃপ্তি বোধ করছি। মশহুর ইংরেজ কবি স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজের এ্যানশিয়েন্ট মেরিনার যেমন সমুদ্রের চারিদিকে থৈ থৈ করা অপানযোগ্য পানি দেখে তার তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারেননি (Water, water everywhere, nor any drop to drink)। তেমনি লক্ষ কোটি শিক্ষিতের মধ্যে উপযুক্ত চাকুরী প্রার্থী মিলছে না। উচ্চতর শিক্ষায়তনে ভর্তির দুয়ারে গিয়ে অপারগ অনেককেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।

শিক্ষা মূল্যবোধকে জাগ্রত করার কথা, মূল্যবোধ অবক্ষয়ের উপলক্ষ হওয়ার কথা নয়। এখানে আমি লাগসই প্রযুক্তি ও টেকসই উন্নয়নের প্রসঙ্গটির প্রতি গুরুত্বারোপ করতে চাই। শিক্ষার্থীর মনে ভালমন্দ জ্ঞানের বিকাশ, দায়-দায়িত্ববোধ, স্বচ্ছতা ও নৈতিক আচরণের উদগাতা, উপলক্ষ ও উপলব্ধি, পারঙ্গমতা তথা দক্ষতা ও যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য যদি না হয় শিক্ষা, বরং শিক্ষা যদি হয় ঠিক বিপরীত সব অবস্থা ব্যবস্থা, তার চাইতে দুঃখজনক অবস্থা আর কি হতে পারে? প্রযুক্তি শিক্ষা হল প্রৎকর্ষতা অর্জনের জন্য, প্রযুক্তিকে কাজে লগিয়ে নতুন পথে নতুন উদ্যমে সময় ও সামর্থ্যকে সাশ্রয়ী করে তুলে অধিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য। শিক্ষা ও প্রযুক্তি যদি অসৃজনশীল, অপচয় অপব্যয় অপ-অভ্যাস গড়ে তোলার পথ পায়, তাহলে তো সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বছরে, ১৮৯৯ সালে, ঔপনিবেশিক শাসন আমলে এ দেশেরই একজন সরকারী স্কুল পরিদর্শক, আহ্‌ছানউল্লা (পরবর্তী কালে খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা) তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন- মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে, নিজের সাথে আহারাদী পাচকস্‌হ পরিপাকের উপায় উপকরণ বয়ে নিয়ে তিনি স্কুল পরিদর্শন করতেন। পরিদর্শিতদের পক্ষ থেকে তাঁকে কোন প্রকার পরিষেবার সুযোগ তিনি দিতেন না। দায়িত্বশীলতার সাথে প্রণীত তার প্রতিবেদন সুদূরপ্রসারী মূল্যায়নধর্মী ফলাফল নিয়ে আসত। ঠিক এই অবস্থার বিপরীতে সাম্প্রতিককালে যদি দেখা যায়, দেশের কেন্দ্রীয় নিরীক্ষা ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা খোদ ঢাকায় বসে ৬০০ কিলোমিটার দূরের কোন শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষককে তার পরিদর্শন ছক পূরণ করে টাকা নিয়ে কেন্দ্রে আসতে বলছেন। টাকার পরিমাণ অনুয়ায়ী নাকি মেলে, তার সুপারিশ সনদ প্রতিবেদন, যাইই বলি না কেন। যিনি নিজে এত বড় দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন তিনি কিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মূল্যায়ন প্রতিবেদন দেবেন? তার তথাকথিত প্রতিবেদনের ওপরই ঐ বিদ্যায়তনের এমপিওভুক্তি, সরকারী

তহবিল থেকে শিক্ষকদের পুরো বেতন প্রাপ্তি কতকিছু নির্ভর করে। আমরা অবশ্যই আশা করব, শেষোক্ত পরিদর্শন প্রক্রিয়াটির কথা যেন সত্য না হয়।

ছোটবেলায় সংস্কৃত পাঠ্য বইয়ে একটা গল্প পড়েছিলাম শিষ্যকে গুরু বলেছেন আমার ধানক্ষেতকে বন্যার পানি থেকে ঠেকাও। উপায়ন্তর না দেখে শিষ্য নিজে শুয়ে আইল হয়ে গুরুর জমিতে পানি আসা ঠেকিয়েছে। এখন তো যেন সেই রামও নেই সেই অযোধ্যাও নেই। অথচ কথা ছিল, শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্র-শিক্ষকসহ আমরা সকলের প্রতি সম্মান, সমীহ, স্নেহ ও দায়িত্ব প্রদর্শন করব। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, সহপাঠী এমনকি সহোদরদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক শিক্ষার হেরফেরে আজ দেখি ভিন্নরূপ ও মাত্রায়। সরকার, সরকারের শিক্ষা দপ্তর, অভিভাবকমণ্ডলী, শিক্ষালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রত্যেকের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আচার-আচরণে বিস্তর বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। অথচ সুসমন্বয় ও দায়িত্ববোধের বিকাশ এখানে অনিবার্য এবং আকাঙ্ক্ষিত।

শিক্ষায় সরকারী বরাদ্দ সংখ্যাগত (নিউমারিকাল) পরিমাণে শনৈ শনৈ গতিতে ও হারে বাড়লেও মূল্যমানের বিচারে প্রকৃত প্রস্তাবে (real term) আনুপাতিক হারে বরাদ্দ ক্রমশঃ কমছে, এমনটি প্রতীয়মান হয়। এখানে অসীম চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির সাথে সসীম বরাদ্দের বনিবনা হচ্ছে না, না হওয়াটাই স্বাভাবিক। দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থার ব্যয় সরকারের কাধে ন্যস্ত হওয়ায় বেসরকারী দায় দায়িত্ববোধ যেমন হ্রাস পেয়েছে, সরকারী বিধিব্যবস্থার বিবরে শিক্ষার হাল হকিকত সোডিয়াম, পটাশিয়াম সর্বোপরি ক্ষেত্রবিশেষে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়েই চলছে কিংবা রক্তশূন্যতায় নিপতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এমতাবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থার পুষ্টিমান ও গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে কি করে? কিভাবে তা হবে ফলবান ও প্রবৃদ্ধি-প্রশান্তি প্রদায়ক?

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সংস্কৃতি দুটি পর্যায়ে মারাত্মক অবক্ষয়ের উপসর্গ হিসেবে শিক্ষাব্যবস্থার অসুস্থতার লক্ষণে পরিণত হয়েছে। যে মানুষ বা ব্যবস্থা, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্বে থাকে, তাদের সততা ও নিষ্ঠা এতটা অপসৃয়মান ও ভঙ্গুর হলে সমাজে নিরাপত্তা ও আস্থার মূল্যবোধ বিকাশ তো দূরের কথা, টিকবে কোন ভরসায়। তাদের লোভ এতই উদগ্র যে, কোন কিছুতে তাদের নিরত রাখা যাচ্ছে না। তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে অসম্ভব অপারগতা তাদের সাহস ও তৎপরতাকে তুঙ্গে তুলে দিচ্ছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে পরীক্ষায় পাশের জন্য লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে যে নাজুক, নিরুৎসাহ ও স্পর্শকাতর আবহ সৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্য খোদ শিক্ষার মূল্যবোধকেই মূল্য দিতে হচ্ছে। শিক্ষায় বিনিয়োগবৃদ্ধির প্রস্তাব ও বরাদ্দের পরিসংখ্যান শুনে গুণগত পরিবর্তনের প্রত্যাশার পরিবর্তে হতাশার হাটবাজার জমছে। অবিলম্বে এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা দরকার, যদি আমরা বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে উপযুক্ত মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে চাই।

পল্লী অঞ্চল ও শহর শিক্ষায়তনগুলোর মধ্যে পাঠদান পরিবেশ, ব্যবস্থাপনার সুযোগ-সুবিধার দূরত্ব বেড়েই চলেছে, মফঃস্বল থেকে পাশ করা মেধাবী ছাত্ররাও শহরের শিক্ষায়তন থেকে পাশ করাদের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছেন না। দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মেধার বিকাশ সীমিত ও শর্তসাপেক্ষ হয়ে পড়ছে। দেশের ভবিষ্যৎ মানব সম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে এই বৈষম্য সৃষ্টি তথা অপয়া অবস্থা দেশ ও জাতির জন্য অশেষ দুর্ভোগ বয়ে আনতে পারে। মেধাশূন্য বিপুল জনগোষ্ঠী সম্পদ না হয়ে সহস্র সমস্যার শৈবালদামে পরিণত হয়ে দেশ ও জাতির বহমানতাকে ব্যাহত করতে থাকবে।

এ সপ্তাহেই ভারতের একাদশতম সাবেক রাষ্ট্রপতি, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. এ পি জে আবদুল কালাম বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। স্থানীয় একটি টেলিভিশন চ্যানেলের তরফ থেকে তিরাশী বছর বয়সী এই চিরতরুণ তত্ত্ববিদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল গোটা উপমহাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভিপ্সায় তার বার্তা কি? তিনি পরামর্শে সোজাসাপটা বলেছেন, বাড়ীতে পিতামাতা ও প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষককে দায়িত্বশীল হতে হবে। তাদেরকে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হিসেবে তৈরি করতে হলে তাদের প্রতি বলিষ্ঠ সুনজর দিতে হবে। জাপানে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষককে সবিশেষ সযত্ন ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখার জন্য রাষ্ট্র সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পরিবারে পিতামাতা কোনভাবেই ভবিষ্যৎ পরিবার দেশ ও সমাজে উপযুক্ত সদস্য সরবরাহে অমনোযোগী হতে পারেন না। সন্তানকে উপযুক্ত আদর্শ, মূল্যবোধ ও চেতনাদাত্রী হিসেবে তারা তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে প্রথমত নিজেদের ও সংসারের স্বার্থে এবং প্রধানত পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির স্বার্থে অবশ্যই মনোযোগী হবেন। আর এই সকল মানুষের দ্বারা, সকল মানুষের জন্য, সকল মানুষের সরকার পরিবার, সংসার, সমাজ ও দেশে অনুকূল পরিবেশ সৃজনে-নিয়ন্ত্রণে, উদ্বুদ্ধকরণে, প্রণোদনে, প্রযত্ন প্রদান, রাজনীতি নিষ্ঠায়, ন্যয়নির্ভরতায়, স্বচ্ছতায়, জবাবদিহিতায়, সুস্থ সাংস্কৃতিক সৌহার্দ-সখ্যতার সন্দেশ সুনিশ্চিত করবেন। সে নিরিখে মানব সম্পদ তথা সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে নবযুগের যে শিক্ষার দরকার, সেই শিক্ষার পথে আমরা আছি কিনা বার বার তার মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা হওয়া দরকার।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
সাবেক সচিব ও
সাবেক চেয়ারম্যান, এনবিআর

আ হা দ হা য় দা র

টেকসই উন্নয়নের মূলকথা সাক্ষরতা আর দক্ষতা

দক্ষতা অর্থাৎ কর্মের উৎকর্ষ, অভিজ্ঞতা, একাগ্রতা ও প্রশিক্ষণ যার পূর্বশর্ত। সাক্ষরতা হল অর্জিত শিক্ষার একটি তুলনামূলক অবস্থা। আর টেকসই উন্নয়ন এমন একটি ধারণা যা বর্তমান সময়ে মানব সমাজের সার্বিক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যত বিনির্মাণের সর্বাধুনিক কৌশল হিসেবে বিশ্বব্যাপী বিবেচিত। টেকসই উন্নয়ন শুধুমাত্র কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রযুক্ত নয়, এটা একটি বৈশ্বিক তৎপরতা, সুপরিকল্পিত একটি পৃথিবীর অস্তিত্ব সুরক্ষাই যার মূল লক্ষ্য।

অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে কৃচ্ছ্রতাসাধনের মাধ্যমে বিকাশমান বিশ্ব সভ্যতার সুফল অনাগত প্রজন্মের সাথে ভাগাভাগি করার এক মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ থেকে ‘টেকসই উন্নয়ন’ ধারণার জন্ম। সাক্ষরতা যেমন মানুষকে তার জীবন-জীবিকার জন্য সঠিক কর্ম চয়নে সহায়তা করে, তেমনি সঠিক কর্ম চয়ন টেকসই উন্নয়নের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। আর দক্ষতা কর্মে পেশাদারিত্ব আনে।

উন্নত বিশ্বে নাগরিকরা তার চারপাশের বিভিন্ন ছোট ছোট অনুসঙ্গ থেকে নিজের কর্ম চয়ন করার সুযোগ পান। সাক্ষরতা ও শিক্ষা তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিরন্তন প্রচেষ্টা আর সাফল্যের মধ্য দিয়ে সেখানে অনেক অপ্রচলিত পেশার কদর ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। প্রযুক্তি ও বৈশ্বিক চাহিদা নতুন পেশা সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের কাজের সুযোগ ও স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সুরক্ষিত রাখে। নাগরিকদের দক্ষ কর্মশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মমুখী শিক্ষার সুযোগ করে দেয়। তাইতো সেখানে গন্ধ শুঁকে বস্তু সনাক্ত করা বা স্বাদ গ্রহণ করে মদের গুণগত মান নির্ধারণ করার মত অপ্রচলিত বিষয়কেও পেশা হিসেবে দেখা যায়।

কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় আমাদের মত উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে শিক্ষাব্যবস্থা, সাক্ষরতা পরিস্থিতি এবং কর্ম চয়নের সুযোগ কোনটিই উপযোগী ও সহজলভ্য নয়। কর্ম সংস্থানের দরজা অবারিত না হওয়ায় আমাদের দেশে ইতিহাস বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারীরা বেছে নেন ব্যাংকার পেশা। আবার প্রাতিষ্ঠানিক কোন ধরনের লেখাপড়া ছাড়াই একজন হতে পারেন নামী ব্যবসায়ী, শিল্প উদ্যোক্তা কিংবা রাজনীতিবিদ। তাই প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে চাহিদাহীন ও যুগ অনুপোযোগী বিষয়ে উচ্চশিক্ষা না দিয়ে আমাদের উচিৎ মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই শিক্ষার্থীদের মেধা ভিত্তিক, সৃজনশীল, বিজ্ঞানমনস্ক, কারিগরী ও কর্মমুখী শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় ছড়িয়ে দেয়া। এ জন্য গড়ে তোলা প্রয়োজন একটি পরিপূর্ণ ও টেকসই শিক্ষাব্যবস্থা যা প্রকৃতপক্ষে টেকসই উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

সাক্ষরতা ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে সাক্ষরতা অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান শিক্ষাকে নাগরিকদের অন্যতম অধিকার হিসেবে নির্দেশনা দিয়েছে। সংবিধানের ১৭ (গ) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে,

রাষ্ট্র আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করবে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই আমাদের দেশে সাক্ষরতা পরিস্থিতি উন্নয়নে ধারাবাহিক কাজ চলছে। তবে স্বাধীনতার ৪৩ বছরেও রাষ্ট্র নাগরিকদের এই মৌলিক অধিকারটি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। গত দুই দশকে জাতিসংঘের 'শতাব্দীর উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' বা এমডিজি সেই প্রচেষ্টায় নতুন গতি এনেছে। আমরা এখন ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

১৯৬৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের এক আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলন থেকে ঐ দিনটি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব এসেছিলো। পরবর্তী কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দিবসটি উদযাপন করা হলেও বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২ সাল থেকে দিবসটি পালন করা শুরু করে। বর্তমানে দিবসটি উদযাপনে আরও অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ বছর এই দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'টেকসই উন্নয়নের মূল কথা সাক্ষরতা আর দক্ষতা'।

বাংলাদেশের সাক্ষরতা পরিস্থিতি

২০১০ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর '১৫ উর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যার সাক্ষরতার হার' শীর্ষক এক জরিপের তথ্য অনুযায়ী ১৯৯১ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিলো ৩৭.২%। গ্রামে ৩০.১% ও শহরে ৫৪.৪%। ২০০৮ সালে এই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে। তখন দেশে সাক্ষরতার হার দাড়ায় ৫৯.১%। গ্রামে ৫২.২% এবং শহরে ৭০,৯%। ২০১১ সালে প্রকাশিত পরিসংখ্যান ব্যুরোর অপর একটি জরিপের তথ্য অনুযায়ী দেশে শহর পর্যায়ে শিক্ষার হার ৬৫.৬% এবং গ্রাম পর্যায়ে ৫০.৬% প্রায়। বলা হয়ে থাকে, বর্তমানে দেশে শিক্ষিতের হার ৬৫%।

ইউনিসেফের এক তথ্য অনুযায়ী ১৯৯০-২০১২ সালের মধ্যে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিলো (১৯৯০-২০১২) ১.৭%। ২০১২-২০৩০ মেয়াদে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত হার ১%। ২০০৮-২০১২ সাল মেয়াদে দেশে পূর্ণবয়স্ক সাক্ষরতার হার ছিলো শতকরা ৫৭.৭%। ২০০২-১২ সাল মেয়াদে দেশে শিশুশ্রম ১৭.৫% (পুরুষ) ও ৮.১% (মহিলা)। ১৫ বছর বয়স সীমার মধ্যে বাল্যবিবাহের হার ২৯.১% এবং ১৮ বছর বয়স সীমার মধ্যে ৬৪.৯%। ঐ সময়ে কৈশোর কালে বিবাহের হার ২.১ (পুরুষ) ও ৪৪.৭% (মহিলা)। এই সূচকগুলো টেকসই উন্নয়ন ও সাক্ষরতা হার বৃদ্ধির অন্তরায়। এসব ক্ষেত্রে আশানুররূপ উন্নতি হলে ২০৩০ সালের আগেই আমাদের দেশে সাক্ষরতা ও শিক্ষার হার শতভাগে উন্নিত করা সম্ভব হবে।

এমডিজি পূরণে করণীয়

এমডিজি বা শতাব্দীর উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় শিক্ষা খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে জাতিসংঘ। এমডিজি-১ ধাপে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। দ্বিতীয় ধাপে ২০১৫ সালের মধ্যে সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সব শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমাদের দেশের সরকারগুলো ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। বর্তমান সরকারের সময়ে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের বৃহৎ পরিসর গড়ে তোলাসহ বিনামূল্যে পাঠ্যবই, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তি, স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ, স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম ইত্যাদি সহ আরও বিভিন্ন উদ্যোগ নিবিড়ভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে।

তবে প্রাথমিক শিক্ষায় এমডিজি-২ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নসহ লক্ষ্য বাস্তবায়ন কৌশলগুলোকে সফলভাবে প্রয়োগ করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সঠিক পরিকল্পনা করতে হবে, অবকাঠামো, উপকরণ খাতসহ সব প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, শিক্ষা প্রদানকারী ও পরিকল্পনাকারীদের দক্ষতা বাড়াতে হবে, শিক্ষা পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহ ও যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নততর করতে হবে। সর্বোপরি পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমন্বয় বাড়ানোর মধ্য দিয়ে অন্যান্য সেক্টরকে সাথে নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

ঝরে পড়া: একটি বড় চ্যালেঞ্জ

সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে অন্যান্য বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া বা ড্রপ আউট প্রতিহত করতে হবে। এটা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক তদারকি (মনিটরিং), পর্যবেক্ষণ (ভিজিলেন্স) ও জবাবদিহিতা প্রয়োজন। ড্রপ আউট প্রতিরোধে নেয়া উপবৃত্তি ও স্কুল ফিডিংসহ এ ধরনের কর্মসূচিগুলো আরও সুষ্ঠুভাবে এবং ব্যাপকভাবে পালন করা প্রয়োজন। এমনকি ঝরে পড়া শিশুর সন্ধানে এবং তাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নিতে ইউপি সদস্যদের মাধ্যমে প্রতিটি ওয়ার্ডের খানাভিত্তিক তল্লাশি চালানো যেতে পারে। ঝরে পড়া সংক্রান্ত তথ্য ও হালনাগাদ পরিসংখ্যান জেলা প্রশাসনের ওয়েব পোর্টালে ধরে রাখা প্রয়োজন। আমাদের বিবেচনায় রাখা উচিৎ যে, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এ ধরনের পরিসংখ্যান বিবেচনায় নিয়েই পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করে থাকে।

অতি সম্প্রতি ইন বাংলাদেশ, লার্নিং হোয়াই চিলড্রেন স্টপ লার্নিং শীর্ষক ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা- এই চার দেশে

প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে এক কোটি ৭০ লাখ শিশু ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের ৯৯ লাখ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। অর্থাৎ এই শিশুদের মধ্যে আমাদের দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু আছে যাদের প্রাথমিক শিক্ষার মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে না পারলে এমডিজি লক্ষ্য বাস্তবায়ন কঠিনতর হয়ে উঠবে।

বাগেরহাটের শিক্ষা পরিকাঠামো

বাগেরহাটে সরকারী ও বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ছাড়াও বেশ কিছু বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন কারিগরী কলেজ, পিটিআই, ভিটিআই, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি প্রযুক্তি কলেজ, যেমন চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শারীরিক শিক্ষা কলেজ, মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট ট্রেনিং স্কুল, হোমিওপ্যাথি কলেজ, টেক্সটাইল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, আইন কলেজ প্রভৃতি। এ সব প্রতিষ্ঠান দক্ষ শ্রমশক্তি উৎপাদন করে চলেছে। তবে এ সব প্রতিষ্ঠান বছরে কত পরিমাণ দক্ষ শ্রমশক্তি উৎপাদন করছে এবং তারা কিভাবে অর্জিত শিক্ষা ও দক্ষতা ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছেন, সে বিষয়ে একটি যথাযথ পরিসংখ্যান জেলার সরকারী ওয়েব পোর্টালে থাকা বাঞ্ছনীয়।

বাগেরহাট জেলা প্রশাসনের ওয়েব পোর্টালে (তথ্য বাতায়ন) উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী জেলায় সাক্ষরতা হার ৭৪.৬২%, শিক্ষার হার ৬৫%। জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ১,১৭০টি, কমিউনিটি বিদ্যালয় ১৭টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ২৪৫টি, এনজিও পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্র ৭৬টি, কিণ্ডারগার্টেন ১০৩টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫০টি, কলেজিয়েট স্কুল ৬টি এবং মহাবিদ্যালয় ৫২ টি।

সাক্ষরতা, দক্ষতা ও টেকসই উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন ধরনের মানদণ্ডের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হচ্ছে নাগরিকের সাক্ষরতা ও দক্ষতা। বিদ্যমান শিক্ষা পরিস্থিতি ও সুযোগগুলো সাক্ষরতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই আমাদের একই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী প্রশিক্ষণ ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম বাড়াতে হবে এবং প্রচলিত ট্রেডের বাইরে নতুন আরও অনেক কর্মোদ্যোগ ও পেশা সৃষ্টি করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগ, সমবায়ভিত্তিক ও এনজিও উদ্যোগ।

বাগেরহাট জেলা যুব উন্নয়ন বিভাগের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কথাই ধরা যাক। প্রতি বছর এই প্রতিষ্ঠান থেকে অন্যান্য ট্রেডের পাশাপাশি রেফ্রিজারেটর মেরামত কাজে ৪০ জন এবং এয়ারকণ্ডিশন মেরামত কাজে ৪০ জন করে মোট ৮০ জনকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ইলেক্ট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং এর উপর প্রশিক্ষণ নেন ৮০ জন এবং মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর আরও ৮০ জন। অর্থাৎ শুধু বাগেরহাট জেলা থেকেই এই চারটি ট্রেডে গত দশ বছরে দুই হাজার চার শত যুবা কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। সারা দেশে এই সংখ্যা নিশ্চয়ই লক্ষাধিক। তাদের সবার ঐ সব ট্রেডে কর্ম সংস্থান হয়েছে কি না খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। অন্যথায় রাষ্ট্রের এই বিশাল বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূমিকা রাখতে পারবে না।

স্বকর্ম উদ্যোগ (সেলফ্ এমপ্লয়মেন্ট)

সাক্ষরতা ও শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা নাগরিকরা জীবিকার জন্য রাষ্ট্র বা তৃতীয় কারও মুখাপেক্ষী না থেকে নিজস্ব সামর্থ্য, সক্ষমতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। এই প্রক্রিয়াকে আমরা সহজ কথায় স্বকর্ম উদ্যোগ বলতে পারি। নিজের জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি এ ধরনের একজন উদ্যোক্তা তার উৎপাদন ব্যবস্থায় আরও অনেকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে পারেন। এভাবেই হাজার হাজার স্বকর্ম উদ্যোক্তার অংশগ্রহণ টেকসই উন্নয়নকে তরান্বিত করতে পারে। স্বকর্ম উদ্যোগ সৃষ্টিতে রাষ্ট্রকে বিশেষ সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালন করতে হবে। নাগরিককে প্রথমেই মৌলিক সাক্ষরতা (সাধারণ পঠন, লিখন ও গণনা করতে পারা) দিতে হবে। তার পর দিতে হবে সাক্ষরতা-উত্তর শিক্ষা (যুক্তাক্ষর ও জটিল বাক্য পঠন ও লিখন) এবং অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ (বই, পত্রিকা ইত্যাদি)। এই পর্যায়ে বাজার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাকে আয়বর্ধক সুনির্দিষ্ট ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। একজন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তাকে (যদি পুঁজির সংকট থাকে) প্রয়োজনীয় পুঁজির সংস্থান করে দিতে হবে। এভাবে সমাজে পৃথক বিভিন্ন ট্রেডে হাজার হাজার স্বকর্ম উদ্যোক্তা সৃষ্টি করে সাক্ষরতা ও দক্ষতাকে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সফলভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। তবে সরকারের অর্থ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো, এনজিওর ক্ষুদ্র ঋণ, ব্যাংকের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা ঋণ (এসএমই) কার্যক্রম প্রকৃত উদ্যোক্তা খুঁজে নিতে ব্যর্থ হলে টেকসই উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

বাজার

সব স্বকর্ম উদ্যোগ ও উৎপাদনের সাথেই জড়িয়ে আছে পুঁজি ও বাজারের প্রশ্ন। পুঁজি উৎপাদন নিশ্চিত করবে আর বাজার ব্যবস্থাপনা ও পণ্যের গুণগত মান দিয়ে নতুন বাজার সৃষ্টি করবে। তাই আমাদের কৃষি, প্রাণী সম্পদ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ইলেক্ট্রনিক্স ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মত খাতগুলোতে স্থানীয় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিসিককে আরও কার্যকর করতে হবে। প্রচলিত ধারার হস্ত ও কুটির শিল্পের মানোন্নয়নের পাশাপাশি নতুন দৃষ্টিনন্দন ও সুলভ পণ্য উৎপাদন করে তার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি করতে হবে। গার্মেন্টস শিল্পের মত

বিশ্ব বাজারে প্রচলিত এ্যাসেম্বলিং যোগ্য পণ্য তৈরির জন্য মাঝারি মানের শিল্প কারখানা স্থাপন করতে হবে।

মুক্ত বাজার অর্থনীতি আর বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার কারণে আমাদের মত দেশে আমদানীকৃত কাঁচামাল-নির্ভর বৃহৎ শিল্প-কারখানা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অব্যাহত কর্মসংস্থান ও পেশা নিশ্চিত করা কঠিন। তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগে শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টি হলে টেকসই উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে। অলস পুঁজি বিনিয়োগে ফিরিয়ে আনতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রায়োগিক শিক্ষা

গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে টেকসই উন্নয়ন ধারণাটি বিকশিত হতে থাকায় এখন বিশ্ব বাজারে প্রায়োগিক শিক্ষা জনপ্রিয় হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রায়োগিক শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। এ ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তুলনায় সহজ, সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুনির্দিষ্ট। প্রায়োগিক শিক্ষায় শিখন ঘন্টা কম, ধরাবাঁধা নিয়মে শৃঙ্খলিত না। উপকরণ নির্ভরতা বেশী। কর্মমুখী শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন মূলক শিক্ষা, জীবিকা ভিত্তিক শিক্ষা ইত্যাদি প্রায়োগিক শিক্ষা। এগুলো সাক্ষরতা বাড়াতে কার্যকরভাবে সহায়ক। এ ছাড়া রয়েছে অব্যাহত শিক্ষা, জীবনমুখী শিক্ষা, সৃজনশীল শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মত কিছু শিখন পদ্ধতি। এগুলো একই সাথে মানুষের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বাড়ায়, আবার মননশীলতাকেও সমৃদ্ধ করে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি এ সব প্রায়োগিক শিক্ষার সংমিশ্রণে কোন ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃত একজন সাক্ষর, শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

টেকসই উন্নয়নের অন্যান্য নিয়ামক

অতি সম্প্রতি বগেরহাটের একটি উপজেলায় একটি বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে পাঁচ হাজার টাকা বেতনে এক বছর মেয়াদে চল্লিশ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শর্ত অনুযায়ী প্রার্থীরা হবে শুধুমাত্র ঐ উপজেলার বাসিন্দা। লিখিত পরীক্ষা দিয়েছেন প্রায় পাঁচশত প্রার্থী। ঘটনাটি থেকে আমরা এলাকার মানুষের বেকারত্ব এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি শিক্ষণীয় ধারণা পেতে পারি। অর্থাৎ টেকসই উন্নয়নের সাথে শুধু সাক্ষরতাই না, সুশাসন, দেশের সার্বিক শিক্ষা পরিস্থিতি, বেকারত্ব, জনসংখ্যা পরিস্থিতি, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জ্বালানি পরিস্থিতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। এ সব বিষয়গুলো একে অন্যের পরিপূরক, যেন একটি চক্র। যেমন শিশুর সঠিক শিক্ষা গ্রহণ সামর্থ্য নিশ্চিত করতে হলে তার সুস্বাস্থ্য অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। মাতৃস্বাস্থ্য নিশ্চিত করবে শিশুর পুষ্টিমান। পরিবারে অর্থের যোগান নিশ্চিত করবে মাতৃস্বাস্থ্য। অর্থের যোগান আসবে কর্মসংস্থান থেকে। নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা, সফল বিনিয়োগ আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রায়োগিক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক শিক্ষা কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে। বিনিয়োগ তৈরি করবে উপযুক্ত বাজার। দক্ষ শ্রমশক্তির সহজপ্রাপ্যতা ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মত বিষয়গুলো সেই বাজার সম্প্রসারণ করবে। এই পরিবেশ সৃষ্টি ও সঠিক ব্যবস্থাপনা করবে সুশাসন। আর এ সব কিছুর সম্মিলিত কার্যকারিতার হাত ধরেই আসবে টেকসই উন্নয়ন।

আহাদ হায়দার
জেলা প্রতিনিধি, বাগেরহাট
প্রথম আলো

[আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে বাগেরহাট-এ ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে আয়োজিত সভায় মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়]

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মাসিক প্রকাশনা *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন থেকে অনেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়ে আমাদেরকে চিঠি দিচ্ছেন। *সাক্ষরতা বুলেটিন* পেতে হলে পাঠকদের কী করণীয় তা আমরা আগেও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছি। তাদের সুবিধার্থে আবারও জানাচ্ছি, এতদিন *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু উচ্চ ডাক মাশুলের কারণে আমাদের পক্ষে আর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বুলেটিন পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আগ্রহী পাঠকদের বুলেটিনের গ্রাহক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতেও *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো অব্যাহত থাকবে। তবে গ্রাহকদেরকে ডাক মাশুল বাবদ বছরে ১০০ টাকা এবং ছয় মাসের জন্য ৫০ টাকা দিতে হবে। এই টাকা সরাসরি অথবা মানি অর্ডারযোগে সম্পাদক, সাক্ষরতা বুলেটিন, গণসাক্ষরতা অভিযান, ৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

ফারদানা আলম সোমা

শান্তিতে ভারত-পাকিস্তানের নোবেল বিজয়

শিক্ষা সব শিশুর অধিকার। অর্থাভাব অথবা যে কোন অজুহাত শিশুর এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজ প্রতিবন্ধকতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। বিশ্বের অতিদরিদ্র দেশগুলোর মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশই ২৫ বছরের স্বল্প বয়সী। সারা বিশ্বে শান্তিপূর্ণভাবে উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হলে শিশু-কিশোর এবং তরুণদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। আর তাই শিশুদের ওপর নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং সব শিশুর শিক্ষার অধিকার আদায়ের সংগ্রামের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন যৌথ ভাবে পাকিস্তানের কিশোরী মালালা ইউসুফজাই এবং ভারতের কৈলাস সত্যার্থী।

মালালা ও কৈলাসের প্রতি সম্মান জানিয়ে নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান থবজন জাগল্যান্ড বলেন, মালালা অল্প বয়সে শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুর অধিকার রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি আরো বলেন, এই দু'জনের একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান। একদিকে একজন ভারতীয় আরেকজন পাকিস্তানী। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের দুই নাগরিক একই লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষার অধিকার আদায়ের সপক্ষে এবং উগ্রবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন যা নোবেল কমিটির কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

৬০ বছর বয়সী কৈলাস শর্মা সত্যার্থী মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী। ভারতের ৫ম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ব্যক্তি তিনি। আর শান্তি-র জন্য নোবেল বিজয়ী হিসেবে মাদার তেরেজার পর তিনি হলেন দ্বিতীয়। ২৬ বছর বয়সে তিনি নেমে পড়েন শিশু অধিকার আদায়ের আন্দোলনে। পাঁচ বছর বয়সে যেদিন প্রথম স্কুলে গিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই শিশু অধিকারের বিষয়টি মনে গেঁথে যায় তাঁর। শিশু বয়সেই মনে ছাপ ফেলে মানুষে মানুষে বৈষম্যের বিষয়টি। স্কুলের পাশেই এক মুচির শিশুসন্তানকে বাবার সঙ্গে কাজ করতে দেখে শিশু কৈলাসের মনে প্রশ্ন জেগেছিল। স্কুলের শিক্ষককদের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করলে তাঁরাও বলেছিলেন, ওরা গরিব, তাই পড়তে পারে না। ওই জবাব শিশু কৈলাসের পছন্দ হয়নি। একদিন সেই ছেলেটির বাবার কাছেই চলে গেলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, আমরা সবাই যখন স্কুলে যাই, ও কেন যায় না? ছেলেটির বাবার জবাব ছিল, কাজ করতেই জন্ম হয়েছে আমাদের। কৈলাস বলেন, আমি সেদিন বুঝতে পারিনি কেন কিছু মানুষ শুধু কাজের জন্যই জন্মাবে আর অন্যরা জীবনকে নানাভাবে উপভোগ করবে। শৈশবের ওই ঘটনা কৈলাসের মনে গভীর রেখাপাত করে।

আর তাই তড়িৎ প্রকৌশলী বিষয়ক পড়াশোনা শেষে কৈলাস খুব বেশিদিন নিজ পেশায় কাজ করেননি। নিজেকে নিয়োজিত করেন স্বেচ্ছাসেবামূলক বেসরকারি উদ্যোগে। ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'বাচপান বাঁচাও আন্দোলন'।

কেবল শিশুদের শ্রমদাসত্ব ও পাচারের হাত থেকেই নয়, তিনি শিশুশ্রম ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু করেন। সর্বকালের সেরা মানবাধিকারকর্মী ডেসমন্ড টুটু, এলি ওয়েসেল, দালাই লামার মতো ব্যক্তির তালিকার পাশে তিনি নিজের জন্য জায়গা করে নিলেন। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘ, গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন (Global Campaign for Education), গ্লোবাল মার্চ অ্যাগেইনস্ট চাইল্ড লেবার (Global March Against Child Labor)-সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দিকনির্দেশনার সঙ্গে জড়িত। নোবেল পাওয়ার আগেই তিনি পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ার্ড ও ডিফেন্ডার্স অব ডেমোক্রেসি অ্যাওয়ার্ড, স্পেনের আলফানসো কমিং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এবং মেডেল অব দ্য ইতালিয়ান সিনেটসহ আরও অনেক সম্মানজনক পুরস্কার।

নোবেল পাওয়ার খবর পেয়ে কৈলাস বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সব ভারতীয়র জন্য এটা অত্যন্ত সম্মানের, এ সম্মান সেসব শিশুর জন্যও, যারা প্রযুক্তি, অর্থনীতির এই অগ্রগতির মধ্যেও দাসত্বের জীবন যাপন করছে। তিনি বলেন, এই পুরস্কার আমি উৎসর্গ করছি পৃথিবীর সব শিশুর প্রতি। কৈলাস মালালাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আমাদের এক সঙ্গে কাজ করতে হবে।

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী মালালার বয়স এখন মাত্র ১৭ বছর। এত অল্প বয়সে এর আগে কেউ নোবেল পুরস্কার পায়নি। এই সর্বকনিষ্ঠ দক্ষিণ এশীয় কিশোরী নোবেল বিজয়ী মালালা ইউসুফজাইয়ের জন্ম ১৯৯৭ সালের ১২ জুলাই পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকায় এক পাখতুন পরিবারে। চরম কট্টরপন্থী তালেবানের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে নারী শিক্ষা নিয়ে কাজ করার জন্য ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর মাথায় গুলি করে মৌলবাদ জঙ্গিরা।

প্রথমে পাকিস্তান ও পরে যুক্তরাজ্যের চিকিৎসার ফলে তার প্রাণ রক্ষা পায়। বর্তমানে সে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছে। তার জন্ম পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মিঙ্গোরা শহরে। শিক্ষা সংগ্রামী মালালা ইউসুফজাইয়ের এই স্বীকৃতি তার স্বদেশ পাকিস্তানের জন্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। পৃথিবীর যেসব দেশে মেয়েরা সবচেয়ে কম সংখ্যায় বিদ্যালয়ে যায়, সেগুলোর মধ্যে পাকিস্তান তৃতীয়। তার ওপর মালালার বাসভূমিতে তালেবানরা মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তারা একের পর এক বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল নারীশিক্ষার প্রতিষ্ঠান।

শত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বাবা জিয়াউদ্দিন ইউসুফজাই-এর সাথে মালালা সোয়াতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষালাভের অধিকার আন্দোলনে নেমেছিল। তালেবানদের জঙ্গী বর্বতার বিরুদ্ধে ২০০৯ সাল থেকে সে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাগুলোকে অনলাইন ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে আন্দোলন শুরু করে। ১৫ বছর বয়সে ২০১২ সালে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পরও সে থেমে যায়নি তাঁর আন্দোলনের পথ থেকে। তাঁর সেই সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসেবে মালালার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কারের গৌরব শুধুমাত্র তার জন্ম স্থান পাকিস্তানের নয়, সারা পৃথিবীর শিক্ষাবঞ্চিত শিশু, বিশেষত মেয়েশিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার সংগ্রাম উজ্জীবিত হবে মালালা ইউসুফজাইয়ের এই বিশাল স্বীকৃতিতে। নোবেল পাওয়ার পর গণমাধ্যমে কথা বলার সময়ে মালালা জানায়, আমি অত্যন্ত গর্বিত এই জন্য যে আমিই প্রথম পাকিস্তানী যে এই পুরস্কার পেয়েছে। এবং আমি নারী। সে আরো বলে যে, এটাই আমার অভিযাত্রার শেষ নয়, বরং শুরু। ভারত ও পাকিস্তানের যৌথ পুরস্কার গ্রহণের বিষয়ে মালালা বলে, আমাদের পুরস্কার নেওয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে অনুরোধ জানাচ্ছি। সে আরও বলে, পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্তে উত্তেজনা চলছে। অকারণে সামরিক বিবাদে জড়িয়ে না পড়ে শান্তি, উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য আমরা লড়াই করতে চাই।

সারা বিশ্বের মানবাধিকার এবং শিক্ষার অধিকার আদায়ে কর্মরত কর্মীরা মালালা ও সত্যার্থীর এ সম্মান অর্জনকে নিজেদের সাফল্য বলে মনে করেন। কৈলাস সত্যার্থী তো বাংলাদেশের মানবাধিকার ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিকট অনেক কাছের একজন মানুষ। তিনি বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে এসেছেন। আমাদের অনেকের তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার এবং তার কথা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। তার অধিকার আদায়ের সংগ্রামের এই স্বীকৃতি দক্ষিণ এশিয়ার তথা সারা বিশ্বের মানবাধিকার ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের অনুপ্রেরণার উৎস্য হয়ে থাকবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

ফারদানা আলম সোমা
কার্যক্রম কর্মকর্তা
পলিসি অ্যাডভোকেসি এন্ড মাস কমিউনিকেশন ইউনিট
গণসাক্ষরতা অভিযান

মাহমুদুল হক

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং জনশক্তি

নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কোন বস্তু যিনি তৈরি/উৎপাদন করেন তিনিই কারিগর। আর এই কারিগর তৈরি করার জন্য দরকার কারিগরি শিক্ষা। অদক্ষ কারিগর কোন সম্পূর্ণ জিনিস ভালোভাবে তৈরি করতে পারেন না। একটি ভবন তৈরির জন্য যেমন দরকার দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, রাজমিস্ত্রি, তেমনি রসগোল্লা তৈরির জন্য ও দরকার দক্ষ কারিগর। এই দক্ষ কারিগর তৈরি হয় অনানুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। কাজের ধরনভেদে কারিগরগণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। যেমন আনুষ্ঠানিকভাবে শেখার জন্য সরকারী/বেসরকারী পলিটেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট; উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য বেসরকারীভাবে পরিচালিত বিভিন্ন। আর অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঘটে নিজের পরিবার, পূর্বপুরুষ অথবা ব্যবসা-কেন্দ্র। এই রচনা মূলত আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত কারিগরি শিক্ষা নিয়ে।

সরকারী পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউট হলো রেভিনিউ খাতের প্রতিষ্ঠান। কারিগরি শিক্ষার প্রসারে সরকারী পলিটেকনিকের পাশাপাশি বেসরকারী পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কারিগরি শিক্ষা বাস্তবায়নের মূল প্রতিষ্ঠান হলো কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। কারিগরি বোর্ডের বাইরে একাধিক মন্ত্রণালয়-এর অধিদপ্তর/ব্যুরো কারিগরি শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশে সরকারী /বেসরকারীভাবে রেভিনিউ ও উন্নয়ন খাতের অর্থে যতগুলো প্রতিষ্ঠান কারিগরি শিক্ষা বাস্তবায়নের কাজ পরিচালনা করছে তার সঠিক পরিসংখ্যান ও তথ্য কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় করে রেকর্ড সংরক্ষিত আছে বলে আমার মনে হয় না। কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে মন্ত্রণালয় কাজ করে থাকে নিম্নবর্ণিত।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়: এই মন্ত্রণালয় মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কোর্সের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়: এই মন্ত্রণালয় শিশু শ্রমিকদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ও শিশু শ্রমিকদের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগ রয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়: এই মন্ত্রণালয় যুবকদের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। গত ৫ বছরে ১০,৮৮,১৪০ জন যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সংখ্যার হিসাবে তা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশি। ৫৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আবাসিক সুবিধা রয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মাধ্যমে বর্তমানে ৩৭টি কারিগরী ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (বিআইএমটি) রয়েছে এবং ৩০টি নতুন টিটিসি ও ৫টি ইনস্টিটিউটে মেরিন টেকনোলজি প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১, ২, ৩-এর মাধ্যমে ৬ মাস মেয়াদি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের কাজ বাস্তবায়ন করেছে কমিউনিটি ভিত্তিক এনজিওদের মাধ্যমে। ২০০১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ১৯,৮৫,৯০৩ জন নব্য সাক্ষরকে বিভিন্ন ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। হাউজ ওয়্যারিং, শ্যালো পাম্প মেকানিক, মাশরুম চাষ, কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার মেকানিক, রেডিও-টেলিভিশন ও মোবাইল সার্ভিসিং মেকানিক, ওয়েলডিং, ফ্রিজ এবং এয়ারকন্ডিশন সার্ভিসিং, বাঁশ ও বেতের কাজ, গবাদি পশু প্রতিপালন, চাবি-বাইসাইকেল-রিকসা মেরামত, স্যানেটারী লেট্রিন তৈরি এবং স্ক্রিন প্রিন্ট, ব্লক, বাটিক ও দর্জি বিজ্ঞানের মতো ট্রেডগুলোর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক): এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও একাধিক ট্রেডের উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

যে কোন মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরি ও ভোকেশনাল কোর্স পরিচালিত হোক না কেন একাডেমিক সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা কেবল মাত্র কারিগরি শিক্ষা বোর্ডেরই রয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয় শুধু প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইন্সট্রাক্টর বা শিক্ষক পদে চাকুরির জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজির ক্ষেত্রে ডিগ্রী থাকতে হবে।

বাংলাদেশের জন্য কারিগরি শিক্ষা এবং সরকারের ভাবনা

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ -এ কারিগরি শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- দেশ ও বিদেশের চাহিদা বিবেচনায় রেখে সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানবসম্পদ দক্ষ ও জনশক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা ।
- দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় বৃদ্ধি করা।

১. সর্বস্তরের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সকল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ভিটিটিআই ও টিটিটিসি-র আসন এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হবে।

২. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত মানসম্মত পুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হবে।

৩. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। এছাড়া পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, লেদার ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

৪. মাধ্যমিক স্কুল/বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে কারিগরি শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

৫. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সুসংহত করার জন্য দেশের সমস্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হবে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে অধিকতর শক্তিশালী করা হবে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান ও জনবলের ব্যবস্থা করা হবে।

৬. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হবে।

৭. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ঘাটতি পূরণের জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৮. নতুন নতুন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনায় পর্যায়ক্রমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে। তবে এগুলোতে অসচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্বল্প ব্যয়ে পড়ার সুযোগ থাকবে।

৯. প্রকৌশল ডিপ্লোমা ও অন্যান্য ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোর্সগুলো দুই শিফটে চালু করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে নির্ধারিত পাঠদানের সময় মানসম্মত পর্যায়ে বজায় রেখে এ ব্যবস্থা করা হবে।

১০. দেশ-বিদেশের কর্মবাজারের চাহিদার আলোকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পর্যায়ের সকল কারিকুলাম নিয়মিতভাবে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হবে।

১১. ভবিষ্যতে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।

কারিগরি শিক্ষার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ১৯৫৫ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ইস্ট বেঙ্গল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নামে ঢাকাতে একটি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করে। ১৯৬৩ সালে খুলনা ও চট্টগ্রামে এবং পরবর্তী কালে ১৬টি জেলাসহ মোট ৪৯টি সরকারী পলিটেকনিক স্থাপিত হয়। ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ হতে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে ১৯৬০ সালে টেকনিক্যাল এডুকেশন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান পার্লামেন্টে দ্য ইস্ট পাকিস্তান টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড আইন পাশ করা হয়। জুন ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড স্থাপিত হয়। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে একটি কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও একটি ভোকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ রয়েছে। ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (৪ বছর মেয়াদী বিএসসি ইনিঞ্জনিয়ারিং), ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও মনোটেকনিক ইনস্টিটিউটে ৪ বছর মেয়াদী ২৮টি টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ও ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে এসএসসি ৩৪টি ও এইচএসসির ১২টি ট্রেডে ২ বছর মেয়াদি ভোকেশনাল কোর্স চালু রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের তথ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম	সরকারী	বেসরকারী	প্রতিষ্ঠানের নাম	সরকারী	বেসরকারী
কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	১টি		কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৩৭টি	
ভকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	১টি		কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	১৩টি	১২১টি
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বিএসসির জন্য)	৩টি		টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট	৬টি	
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	৪৯টি	৩৭৩টি	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট	৪০টি	
টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ	৬৪টি		এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা)	৪টি	১৪৪৯টি
দাখিল ভোকেশনাল	১০০টি নির্বাচিত মাদ্রাসা		শর্টকোর্স (৩৬০ঘন্টা (৩/৬ মাস)	৯টি	১৫৪১টি

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা

১. বিএসসি করার ক্ষেত্র সংকুচিত: ৪৯টি সরকারী ও ৩৭৩টি বেসরকারী পলিটেকনিক থেকে ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি (ডুয়েট) ছিল শিক্ষার্থীদের বিএসসি করার একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান। ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীরা শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শুধু মাত্র কম্পিউটারে) বিএসসি পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষার্থীরা যাতে বিএসসি করতে পারে সে লক্ষ্যে ফরিদপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বরিশালে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান।

২. কারিগরি থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা চাকুরির বাজারে চরম বৈষম্যের শিকার: আধুনিক ও যান্ত্রিক প্রযুক্তির উপর ভর করে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশই যেখানে উন্নতির শিখরে পৌঁছে গেছে, সেখানে আমরা শুধু প্রযুক্তিতে পিছিয়ে আছি তা নয়, উন্নত দেশগুলির উপর আমাদের নির্ভরশীলতা বহুগুণ বেড়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়ন না হওয়ার কারণে আমরা একদিকে বিদেশ নির্ভর হয়ে পড়েছি, অন্যদিকে এই শিক্ষার উন্নয়নে হাজারো বাধা তৈরি করে রাখা হয়েছে বৈষম্যমূলক আইনের বেড়াজাল দিয়ে। বৃটিশ আমল থেকে এদেশের মানুষ কখনো দেশের বাইরে কখনো নিজ দেশের মানুষদের কাছ থেকে বৈষম্যমূলক আচরণ পেয়ে আসছে যা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নকে প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত করছে। আজ শিক্ষা গ্রহণের স্বাধীনতা সবাই পাচ্ছে কিন্তু তা অগোছালো, বৈষম্যমূলক। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে কম প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। চাকুরিতে কারিগরি থেকে পাশ করা ডিপ্লোমা পাশদের পদবী দেওয়া হয়েছে সুপারভাইজার। ২০০৮ সালে প্রকাশিত গেজেটে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের সুপারভাইজার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের পদ-পদবী, বেতন- ভাতায় বৈষম্য। ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় না, কল-কারখানায় প্রোডাকশন হয় না, জাহাজ স্টীমার চলে না, সেখানে ইঞ্জিনিয়ারদের গুরুত্ব নাই। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের বিএসসি পড়ার জন্য মাত্র একটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। কারিগরি থেকে ডিপ্লোমা পাশ ইঞ্জিনিয়ার ও অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা দুই দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজপথে নামতে বাধ্য হয়।

৩. সাধারণ শিক্ষার সাথে কারিগরি শিক্ষার মানে বৈষম্য: স্নাতক ডিগ্রীর পর মাষ্টার্স ডিগ্রী শেষ করতে লাগে ৭ বছর (এইচএসসি-২ বছর, স্নাতক-৩ বছর, মাষ্টার্স-২ বছর)।

অনার্সসহ মাষ্টার্স ডিগ্রী শেষ করতে লাগে ৭ বছর (এইচএসসি-২ বছর, অনার্স -৪ বছর, মাষ্টার্স-১ বছর)। ডিপ্লোমাসহ মাষ্টার্স ডিগ্রী শেষ করতে লাগে ৮ বছর (ডিপ্লোমা-৪ বছর, বিএসসি-৩ বছর, মাষ্টার্স-১ বছর)। কেন ডিপ্লোমা হোল্ডারদের মাষ্টার্স ডিগ্রী শেষ করতে ৮ বছর লাগে তার সঠিক ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না?

৪. কঠোর নিয়মে আবদ্ধ নতুন পলিটেকনিক ও নতুন টেকনোলজি খোলার সুযোগ: কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণে সরকার ইচ্ছা করেই অনেকগুলো প্রতিবন্ধকতার সৃস্টি করে রেখেছে যা কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের পথে বড় বাধা। নতুন নতুন পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ইন্সস্টিটিউট খোলা দরকার। কিন্তু ছোট খাটো সমস্যা দেখিয়ে কারিগরি শিক্ষার প্রসারকে সংকুচিত করে রাখা হচ্ছে। নতুন পলিটেকনিক ও নতুন শাখা বা কোর্স চালু করতে হলে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১০ শতাংশ জায়গা এবং ঐ জায়গার উপর ভবন থাকতে হবে। অনেক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নতুন পলিটেকনিক স্থাপন ও পুরোনো পলিটেকনিকে নতুন করে শাখা বা কোর্স সংযোজন করতে পারছেন না। বেসরকারী পলিটেকনিকের তালিকা হতে জানা গেছে শুধুমাত্র কম্পিউটার টেকনোলজি দিয়ে ইউনিভার্সেল ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি নামের প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত পলিটেকনিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে জানা গেছে একটি টেকনোলজির জন্য ক্যাম্পাস ভাড়াসহ শিক্ষকদের বেতন/ভাতা, ল্যাব তৈরি ও প্রশাসনিক খরচ চালানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। স্থানীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশ সত্ত্বেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ ঐ প্রতিষ্ঠানে নতুন টেকনোলজি অনুমোদন দিতে রাজী হয়নি। প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দেখা গেছে তাদের একাধিক টেকনোলজি চালানোর মতো সুপরিসর ক্যাম্পাস, ল্যাব ও জনবল রয়েছে।

৫. গুরুত্বহীন কারিগরি শিক্ষা: ২০১২ সালে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নবম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর অনুপাতে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর তুলনামূলক চিত্র

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চলমান প্রোগ্রাম:

একাডেমিক প্রোগ্রাম	সমমান	কোর্সের নাম	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের ধরন	মেয়াদ
		বিএসসি ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন	টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	
ব্যাচেলর ডিগ্রী	বিএসসি	বিএসসি ইন লেদার টেকনোলজি বিএসসি ইন ফুটওয়ার টেকনোলজি বিএসসি ইন লেদার প্রোডাক্ট	টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৩ বছর
ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম	এইচএসসি	ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স: • কম্পিউটার টেকনোলজি • সিভিল • ইলেকট্রিক্যাল • মেকানিক্যাল • পাওয়ার • অটোমোবাইল • রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশন • ইলেকট্রনিক্স • আর্কিটেকচার • কেমিক্যাল • ফুড • এনভায়রনমেন্ট • ইনস্টিটিউট অব প্রসেস কন্ট্রোল • ইলেকট্রো মেডিকেল • কন্সট্রাকশন • টেলি কমিউনিকেশন • মেকট্রনিক্স টেকনোলজি	ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট	৪ বছর
		ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার	ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট	৪ বছর
		ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল	ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট	৪ বছর
		ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ	ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট	৪ বছর
		ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি	ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট	৩ বছর
		ডিপ্লোমা ইন মেরিন	ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট	৪ বছর
সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম	এইচএসসি	এইচএসসি ভোকেশনাল কোর্স: • অডিও ভিডিও সিস্টেম • ড্রেস মেকিং এন্ড ট্রেইলারিং • কৃষি ভিত্তিক খাদ্য • অটোমটিভ • বিল্ডিং মেইটেন্যান্স	টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ	২ বছর
	এইচএসসি	এইচএসসি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট	টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ	২ বছর
	এসএসসি	এসএসসি ভোকেশনাল	ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট	২ বছর
	এসএসসি	এসএসসি দাখিল ভোকেশনাল	দাখিল মাদ্রাসা	২ বছর
সর্ট কোর্স	অষ্টম শ্রেণি	কম্পিউটার অপারেশন এন্ড নেটওয়ার্কিং ইলেকট্রিক হাউজ ওয়ারিং রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং	টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কুল	৩ মাস এবং ৬ মাস

৬. জাতীয় বাজেটে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ: রাষ্ট্রীয়ভাবে কারিগরি শিক্ষা কম গুরুত্ব পাওয়ার কারণে বাজেটেও কম বরাদ্দ দেওয়া হয়।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে জাতীয় শিক্ষা বাজেটের মাত্র ২% বরাদ্দ রাখা হয়েছে কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, শিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দের বিষয়টি নিয়ে সর্ব মহল থেকে কথা বলা হলেও কারিগরি শিক্ষার বাজেট নিয়ে আজ পর্যন্ত জাতীয় সংসদ, পত্রিকা, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এমনকি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের কথা বলতে শোনা যায়নি। আমাদের জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ আসে বিদেশে কর্মরত দক্ষ শ্রমিকদের আয় থেকে। আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে কারিগরি শিক্ষা। উৎপাদন যন্ত্রকে সচল রাখে কারিগরি থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ারগণ। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষ শ্রমিক পেলে চাকুরিতে যোগদানের দিন থেকেই সুফল পেয়ে থাকে। উৎপাদিত পণ্যের গুনগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রয়েছে দক্ষ শ্রমিকদের।

৭. শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা: গত মার্চ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত সারা দেশে ১৮টি সরকারী এবং ৫টি বেসরকারী পলিটেকনিক ও ২টি সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ পরিদর্শন করার সুযোগ হয়েছিল। ১৮টি সরকারী পলিটেকনিকের মধ্যে ৬০% পলিটেকনিকে শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক সুবিধা নাই। অনেক দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা মেসে উচ্চ মূল্যে ভাড়া ও খাওয়ার খরচ যোগাতে না পেরে পড়ালেখা ছেড়ে বাড়ি চলে যায়। সবচেয়ে বড় কথা হলো শিক্ষার্থীদের জীবনে ৪ বছরের কোর্সগুলো (যেমন-অনার্স, ডিপ্লোমা) উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও কর্মজীবনের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা খুবই প্রয়োজনীয়। আবাসিক হোস্টেল শুধুই শেখার জায়গা নয়, বরং অফুরন্ত শেখার জায়গা। শেখার বিষয়গুলো শেয়ারিং করা, টিম ওয়ার্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ, আবাসিক শিক্ষকদের পরামর্শ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মেশার সুযোগ শুধুই আবাসিকের শিক্ষার্থীরা বেশি পায়। মানসম্মত শিক্ষার বিষয়টিকে মাথায় রেখে সকল পলিটেকনিকে শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৮. শিক্ষক প্রশিক্ষণ: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোন রেকর্ড পাওয়া যায়নি। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে একটি কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও একটি ভোকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ রয়েছে। বেসরকারী পলিটেকনিক ও ভোকেশনালের শিক্ষকরা এই প্রশিক্ষণের সুযোগ কতটুকু পাচ্ছেন তা আমার জানা নাই। একাধিক শিক্ষকের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, বেসরকারী পলিটেকনিক কর্তৃপক্ষই চান না একাডেমিক কাজ ফেলে কোন শিক্ষক দীর্ঘদিনের জন্য প্রশিক্ষণে যাবেন। সরকারী পলিটেকনিকের শিক্ষকরা কতটুকু সুযোগ পান এই তথ্য পাওয়া না গেলেও সরকারী-বেসরকারী সকল শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে হলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৯. মিডিয়ার চোখে কারিগরি শিক্ষা: সরকারীভাবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে কম গুরুত্ব দেয়ার কারণে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমেও এই শিক্ষাকে কম গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়ে থাকে। যখন

কোন পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়, তখন দেখা যায় সাধারণ শিক্ষায় পাশ করা শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ করার জন্য ১/২ পৃষ্ঠা দিতে কার্পণ্য করেন না পত্রিকা কর্তৃপক্ষ। আর কারিগরি থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশের তথ্য মাত্র ৩/৪ ইঞ্চি ১ কলাম জায়গার মধ্যে শেষ করা হয়। এটা শুধু প্রিন্ট মিডিয়া নয়, প্রচারের সব মাধ্যমেই কারিগরি শিক্ষাকে কম গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। প্রচার মাধ্যম কারিগরি শিক্ষার প্রসারে অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

১০. কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অধিভূক্ত হেলথ টেকনোলজির শিক্ষার্থীরা সরকারী চাকুরির জন্য অযোগ্য: কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম হলো হেলথ টেকনোলজি। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সরাসরি কোন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে হেলথ টেকনোজি প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করে না। সম্পূর্ণ বেসরকারীভাবে হেলথ টেকনোলজি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে বেসরকারীভাবে বাস্তবায়িত হলেও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে হয়। বাংলাদেশে মোট ১১২টি বেসরকারী ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে হেলথ টেকনোলজি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রথম দিকে এই টেকনোলজির মেয়াদ ছিল ৩ বছর। ২০১৪ সাল থেকে মেয়াদ বাড়িয়ে ৪ বছর করা হয়েছে। কারিগরি বোর্ডের অধীনে ৪ বছর মেয়াদী ডেন্টাল, ফিজিওথেরাপী, প্যাথলজি, নার্সিং, ফার্মেসীসহ একাধিক টেকনোলজিতে পাশ করে শিক্ষার্থীরা সরকারী চাকুরিতে আবেদন করার সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে হেলথ টেকনোলজিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হওয়ার আগ্রহ কম। যারা বেসরকারী চাকুরি ও নিজে প্যাথলজি বা ডেন্টাল ক্লিনিক খোলার চিন্তা করছেন তারাই কেবল কারিগরি বোর্ডের হেলথ টেকনোলজিতে ভর্তি হচ্ছেন। কোন কোন প্রতিষ্ঠান সরকারী চাকুরিতে আবেদন করা যাবে, এমন মিথ্যা আশ্বাস দিয়েও শিক্ষার্থী ভর্তি করাচ্ছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পরিচালিত ম্যাটস ও আইএসটি: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরও বাস্তবায়ন করছে মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) ও আইএসটি। সরকারী অর্থায়নে ৭টি আইএসটি এবং ৮টি ম্যাটস পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া বেসরকারীভাবে ৩৯টি ম্যাটস পরিচালিত হচ্ছে। এখান থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা সরকারী চাকুরিতে আবেদন করার সুযোগ পাচ্ছে। ম্যাটস এবং আইএসটি সম্পূর্ণ সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থে পরিচালিত হচ্ছে।

হেলথ টেকনোলজি নিয়ে দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে রয়েছে মতদ্বৈধতা। সরকারের দ্বৈত নীতির কারনে হেলথ টেকনোলজির হাজার হাজার শিক্ষার্থী সরকারী অর্থায়নে পড়ালেখা এবং সরকারী চাকুরিতে আবেদন করার সুযোগ পাচ্ছে না।

কারিগরি ও বৃত্তিমুলক শিক্ষা প্রসারে কতিপয় সুপারিশ

- প্রত্যেক উপজেলায় কমপক্ষে ৫টি করে ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা। অবকাঠামোগত খাতে খরচ কমানোর জন্য উপজেলার যে জুনিয়র হাই স্কুলগুলো রয়েছে সে স্কুলগুলোর নবম শ্রেণি হতে দুই বছরের ভোকেশনাল কোর্স চালু করা;
- প্রত্যেক উপজেলায় কমপক্ষে একটি পলিটেকনিক স্থাপন করা। যে কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী কম সে কলেজগুলোর অবকাঠামো ব্যবহার করে একাডেমিক কোর্স চালু করা;
- উপজেলা পর্যায়ের জুনিয়র হাই স্কুল ও কলেজে যে ভোকেশনাল ও পলিটেকনিক স্থাপিত হবে তার ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকবে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের;
- বিদ্যমান সরকারী পলিটেকনিকগুলোতে ভর্তির কোটা বৃদ্ধি করা এবং চাহিদা অনুযায়ী ইন্সট্রাক্টর নিয়োগ দান;
- সকল সরকারী পলিটেকনিকে শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক হোস্টেলের ব্যবস্থা;
- সরকারী-বেসরকারী পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ইন্সট্রাক্টরদের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;
- কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্ত সকল হেলথ টেকনোলজি ইন্সস্টিটিউট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে হস্তান্তর করতে হবে;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে অধিক পরিমাণে বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।

সর্ব স্তরে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে স্কুল কলেজগুলোর কারিকুলামে কম্পিউটারকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, অফিস আদালতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, মোবাইল নেটওয়ার্ক দেশে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটিয়েছে। দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ প্রয়োজন। ইঞ্জিনিয়ার/কারিগর ছাড়া উৎপাদন হয় না। অথচ এই শিক্ষার প্রসারে আমাদের আগ্রহ নাই। প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে গুরুত্ব না দিয়ে আমরা তথ্য ও প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটাতে চাই। আমরা জানি যার যত সম্পদ আছে সেই বেশি ধনী। এই সম্পদ ধার করা সম্পদ হলে হবে না। নিজস্ব উৎপাদিত সম্পদ/তৈরি করা সম্পদ হতে হবে। সম্পদের মালিক হতে হলে সম্পদ তৈরির কারিগর তৈরি করতে হবে। কারিগর তৈরির কাজটি করতে হবে মাধ্যমিক স্কুল থেকেই। আমরা প্রযুক্তির সুফল পেতে চাই, কিন্তু প্রযুক্তিবিদ তৈরি করতে চাই না। কারিগরি শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ করা হলে দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে একদিকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হবে অন্যদিকে, নতুন নতুন উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির সুযোগ তৈরি করবে এবং বাইরের দেশ থেকে আমাদের আমদানি নির্ভরশীলতা কমে আসবে।

মাহমুদুল হক
শিক্ষা উন্নয়নকর্মী

সা ম ন্ত ভ দ্র

শিক্ষার অভিব্যক্তি

বিশ্ব বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ওয়ালর্ডফ-এর মতে সমানুপাতিকভাবে শিশুর শারীরিক অনুশীলন, অনুভবের জগত, চিন্তাধারা এবং সব ধরনের মানবিক গুণ বিকশিত হয়ে উঠতে পারে, এমন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। উদ্দেশ্য এবং আশা পৃথিবীর মাটিতে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের প্রেরণায় প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছানো।

শিক্ষা জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির পূর্বশর্ত। আর এই শর্ত পূরণের মাধ্যমে হচ্ছে প্রতিষ্ঠান এবং একমাত্র কাণ্ডারী হচ্ছে শিক্ষক। শিক্ষা এবং শিক্ষক, একটা অন্যটার সম্পূরক এবং পরিপূরক দুটোই। শিক্ষা মনের প্রসার ঘটায়, মানুষকে ভবিষ্যৎমুখী এবং উৎপাদনমুখী করে তোলে। এতে কোন দীনতা এবং সংকীর্ণতা নেই। শিক্ষায় সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। এতে উৎপন্ন হয় নৈতিক এবং শক্তিশালী মানসিকতা। এরকম শিক্ষার একটি ভিত্তি আমাদের দেশে ছিল, এখনোও তা অদৃশ্য হয়ে যায়নি এবং পুনরুত্থান সম্ভব।

জ্ঞানী ও গুণীজনের উপদেশ, 'অতীতের সফলতা এবং বিফলতার অভিজ্ঞতা নিয়ে ভবিষ্যতের পথ চলা। আগামীকাল নিয়ে কথা বলার আগে, বর্তমান নিয়ে একটু ভাবা যায়, যেহেতু বর্তমানের পথ ধরেই পৌঁছাতে হবে আগামীতে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানের পথটি খুবই এবড়ো-থেবড়ো, মোটেও মসৃণ নয়। পদে পদে সেখানে বিপদ। আজকের সমস্যাগুলি যদি সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারি, আমরা তাহলে হয়তো আগামী দিনের জন্য কিছুটা হলেও সুবিধা তৈরি করতে পারব।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তিনটি ধারায় বিভক্ত, বৈষম্যনির্ভর এবং বৈষম্য উৎপাদনকারী। ধরে নেয়া হয়েছে, যারা মাদ্রাসায় যাবে, তারা আসবে গরীব পরিবার থেকে, আর যারা বাংলা-মাধ্যম স্কুলে যাবে, তারা আসবে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, আর যারা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে যাবে, তারা হবে উচ্চবিত্ত পরিবারের। এই বিভাজন অনুযায়ী, মাদ্রাসার গ্রাজুয়েটদের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্রও আমরা নির্ধারণ করে রেখেছি, মসজিদ, মাদ্রাসা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে। বাংলা স্কুলের গ্রাজুয়েটদের আমরা পাঠাবো সচিবালয় এবং সওদাগরি অফিসে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি হবেন; ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র।

এই বৈষম্যের জন্য মাদ্রাসায় ইংরেজি অবহেলিত, বিজ্ঞান অবহেলিত। বাংলা মাধ্যম স্কুলে ইংরেজি আছে না থাকার মত, বিজ্ঞান আছে না থাকার মত। অথচ ইংরেজি মাধ্যমের ইংরেজির যে রকম প্রাবল্য, ঠিক অনুরূপ বিজ্ঞানেরও। সিলেবাসটিও বৈশ্বিক, তারা পরীক্ষা দেয়, ইংল্যাণ্ডের কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনে এবং তার তদারকিতে। কাজেই যে বৈশ্বিক মানের শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে, তাতে দেখা যায়, বাংলাদেশে খুব ক্ষুদ্র সংখ্যক ছাত্র তার সুযোগ পায়, আবার ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো রয়েছে গুণগত অনেক তারতম্য। হাতে-গোনা কয়েকটি স্কুল ছাড়া বাকিগুলোতে পড়াশোনার মান অতীব দুর্বলই বলা চলে। আজ গ্রামের মানুষ চিরস্থায়ী দারিদ্র্যের মতো, চিরস্থায়ী অশিক্ষা এবং নিম্নমানের শিক্ষার ফাঁদে পড়ে আছে।

স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের দেশে শিক্ষা নিয়ে অভাব অভিযোগ, ভাবনা চিন্তা ও দুচিন্তার অন্ত নাই। সাম্প্রতিক সময়ের দেশের নাগরিক, সমাজ, শিক্ষিত মহল এবং সচেতন মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মহল দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। দুর্নীতি, অনিয়ম এবং মানের অধঃগতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিশৃঙ্খলার মত গর্হিত বিষয়গুলি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে ক্রমেই দানা বেঁধে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে, ইউনেস্কোর দলিলে বর্ণিত ধারার প্রতি বিশ্বস্ততা রেখে, দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে দেশের সরকারী প্রাথমিক স্কুল ছাড়াও, ২০ হাজারেরও অধিক বেসরকারি কেজি স্কুল, ১৬০০০ হাজারের অধিক, এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং ৫০,০০০ হাজারেরও অধিক এনজিও স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম চলছে। এসব প্রতিষ্ঠান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার চিরায়ত নিয়ম এবং ধারণায় চলছে না। কেজি স্কুলগুলোর শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবির মতে জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায়, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারণায়, দেশের লক্ষ লক্ষ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য

প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে না। অধিকন্তু, এই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এখনো শহর-কেন্দ্রিক এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ফলে দেশের কোটি কোটি শিশু, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এই শিশুরা শিক্ষা জীবনের শুরুতেই বৈষম্যের শিকার হচ্ছে অর্থাৎ এদেরকে কোন প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই প্রাথমিক স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে হচ্ছে।

সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার, এতসব ধারা উপধারায় শিশুরা খুব কমই উপকৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা এ পর্যন্ত মানের অধোগতি এবং বৈষম্যের দূরত্ব ব্যতীত আর বিশেষ কিছু অবদান রাখতে পারিনি। যে শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের শিশুরা সততা, সাহস, ধৈর্য্য, দায়িত্ববোধ এবং দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারে সচেতন হবে, সেই শিক্ষার অভাব রয়েছে। যে শিক্ষার মাধ্যমে আমরা আমাদের চিন্তাশক্তি ও অনুভূতি দুটোকেই ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারি, সেটাই হচ্ছে আসল শিক্ষা। এই বিশ্বায়নের যুগে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে অন্যের সাথে তাল মিলিয়ে, শিক্ষার উন্নয়নে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। এই প্রতিযোগিতায় উৎকর্ষ লাভ করতে হলে, মানসম্মত কৌশল, শ্রম, সদিচ্ছা এবং স্বচ্ছতার প্রয়োজন, যা সকল উন্নত দেশে বিদ্যমান। শিক্ষার উন্নয়নে চাই, 'পরিবেশ এবং শিক্ষাদাতার উপযুক্ত সংযোজন ক্ষমতা'। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় উপকৃত হওয়ার প্রকৃষ্ট উপায়সমূহের মধ্যে প্রথমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, শিক্ষাদাতার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ববোধ এবং প্রতিশ্রুতি। শিক্ষায়তনের নৈতিকতা জাতীয় জীবনে এর একটা প্রভাব রয়েছে। বর্ণিত বিষয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে শ্রেণীকক্ষে সার্থক এবং কার্যকরী শিক্ষাদান বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

শিক্ষাদান প্রণালী

১. দৈনন্দিন শিক্ষাদানে শিক্ষকের উৎকর্ষ অর্জন এবং প্রচেষ্টা;

২. ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অনাবিল স্নেহ এবং শান্ত ভাব পোষণ;

৩. ছাত্র-ছাত্রীদের শরীরের যত্ন এবং স্কুল বিষয়ক সকল বিষয়ে কঠোরভাবে বিষয়ী হওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার দক্ষতা অর্জন;

৪. শিক্ষণীয় সকল বিষয়ে যেমন- শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা, শিক্ষণীয় সকল বিষয়ে অর্থবহ উদ্ভাব এবং আকর্ষণীয় শিক্ষা প্রদান কৌশল;

৫. স্কুলে এবং স্কুলের বাহিরে সর্ব সময়ে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের আচার আচরণের ব্যাপারে সর্তক থাকা;

৬. ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলার ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে এবং মৃদুভাষী হতে হবে;

৭. শিক্ষাদাতাকে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে দক্ষ এবং কর্তৃত্বে বিচক্ষণ হতে হবে;

৮. ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এককভাবে লেখা এবং পড়ার ভাব প্রকাশে দুর্বলতা এবং বাদ পড়া বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হতে হবে;

৯. শিক্ষা প্রদান বিষয়ক সকল বিষয়ে, ছাত্র-ছাত্রীদের নম্বর প্রদান, উৎসাহ দান এবং উচ্চ বৃত্তি প্রদান বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে ন্যায়পরায়ণ থাকা এবং

১০. ছাত্র-শিক্ষক সমঝোতা, ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত জীবনযাপন গড়তে শিক্ষকের রুচিশীলতায় উদ্যমী হতে হবে।

বর্ণিত অবস্থা এবং শর্তসমূহ সঠিকভাবে নিশ্চিত করা হলে, এটা সুনিশ্চিত যে, ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের বিষয়ভিত্তিক পাঠসমূহ, তাদের শিক্ষাদাতার নিকট থেকে আদর্শগত এবং নৈতিক শিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হইবে। আমাদের দেশে, স্কুল কলেজে আমরা যেসব বিদ্যা অর্জন করি, তা আমাদের মধ্যে তথ্যমূলক জ্ঞান বাড়ায় ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের মূল্যবোধভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করা অধিক প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়, নৈতিক চরিত্র গঠনের ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যে শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের শিশুরা সততা, সাহস, ধৈর্য্য, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং কর্মদক্ষতা সম্পর্কে সচেতন হবে, তার অভাব রয়েছে।

শিক্ষকগণের গোজামিল পাঠদান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান সমস্যা শিক্ষার জন্য ক্ষতিকর। ক্লাসে এসে শিক্ষকেরা নামমাত্র দায়সারা গোছের কোনমতে পড়িয়ে বিদায় নেন। এতে ক্লাসে ৯০%-৯৯% ছাত্র না বুঝা অবস্থায় থেকে যায়। এ রহস্যের আসল রূপ, দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত বলা যায়, শিক্ষক যে বিষয়ে পড়াচ্ছেন, ঐ বিষয়ে শিক্ষকের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা এবং পারদর্শিতা কম। দ্বিতীয়ত বলা যায়– দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের দৃষ্টি এবং উদ্দেশ্য নিবদ্ধ থাকে অন্য দিকে। তারা সুযোগ বুঝে ক্লাসে ছাত্রদের প্রাইভেট বা কোচিং সেন্টারের দিকে ইঙ্গিত দেয়। প্রথমটার ব্যাপারে কিছুটা সংশয় থাকলেও, দ্বিতীয়টি চিরসত্য বলা যায়। অর্থের মোহে পড়ে, শিক্ষকরা পাড়ি জমান ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠা কোচিং সেন্টারের দিকে। কেউ কেউ আবার নিজ বাসায়, দলবদ্ধভাবে প্রাইভেট পড়ানোর আয়োজন করে থাকেন।

বর্ণিত অনিয়ম, দুরবস্থা এবং বিপর্যয়ের কারণে ছাত্ররা ক্লাসে পড়া না বুঝায় বিপাকে পড়ে, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অভিভাবকেরাও কম চিন্তিত নন। কিভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের পাশ করাবে, সেই চিন্তায় দিশাহারা হয়ে, অভিভাবকগণ বাধ্য হয়ে তাদের সন্তানদের প্রাইভেট কিংবা কোটিং সেন্টারে ভর্তি করায়। সেখানে নাই জ্ঞানের সাধনা, আছে ব্যস্ততা এবং কলাকৌশল। পরীক্ষা পাশের মোহ তাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করে ফেলে, যা ভবিষ্যত জীবনের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হয়ে উঠে। এই অস্বাভাবিক পাশের কারণে কর্ম জীবনে এসে কষ্ট পোহাতে হয় পরবর্তী কালে এরাই হয়ে উঠে জাতীয় বোঝা এবং সমস্যা। অথচ এদের অনেকেই একবিংশ শতাব্দীর জিপিএ-৫ প্রাপ্ত।

সর্বদিক বিবেচনা করে, এই দুরবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কোচিং সেন্টারের উপর হতে নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। শিক্ষকদের মানসম্মত পাঠদানে বিশেষভাবে মনযোগী হতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ পাঠদানের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে

যুগোপযোগী, শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার মানের অবনতির ফলে শিক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহ দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং জাতীয় জীবনে ব্যাপক অবক্ষয় নেমে আসছে। যার ফলে, পরীক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটছে। শিক্ষার মানের এই ক্রমাবনতি অবশ্যই রোধ করতে হবে। ছাত্ররা যাতে পাঠ্য বইয়ের খুঁটি নাটি সব কিছু পড়ে বুঝতে পারে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, উপরি অর্থ এবং হীন স্বার্থের মোহে অবৈধ পন্থার প্রশয় নেয়। পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্ন পত্র ফাঁস করে দেওয়ার প্রবণতা একটি বড় দোষ এবং অপরাধ। অনেক শিক্ষাঙ্গনের কিছু শিক্ষক তাদের প্রিয় ছাত্রদের জন্য বা প্রতিষ্ঠানের নামের জন্য এমন অন্যায় কাজের আশ্রয় নিয়ে থাকেন, যা একজন সৎ এবং মেধাবী ছাত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। শিক্ষাঙ্গনে সঠিক পড়াশুনা না হওয়া, অধিকন্তু তাতে আরও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চলার কারণে প্রকৃত, নিষ্ঠাবান এবং নিরীহ শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারে না। ফলে তারা বাধ্য হয়ে দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসীদের ছত্র-ছায় চলে যায়। বিষয়টি মর্মান্তিক। বর্তমানের সমস্যা এবং দুর্নীতি নিরসনে, বিদ্যমান শিক্ষাবোর্ডগুলির ক্ষমতা কমিয়ে সরাসরি জবাবদিহিতাসহ কার্যক্রম পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধান করার জন্য বিভাগীয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সোজা কথা, সকল শিক্ষক যদি স্ব স্ব দায়িত্বে সচেতন হন, তা হলে সমস্যা কোথায়?

শিক্ষক নিয়োগের সময়ে, যে বিষয়ে শিক্ষক নেয়া হবে, সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে, শিক্ষক কতটুকু পারদর্শী এবং অভিজ্ঞ তা দেখতে হবে। কারণ, তিনিই হবেন নির্দিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন গড়ার একমাত্র ব্যক্তি। তাদের সার্বিক প্রচেষ্টায়, সমাজ উন্নয়নের ভবিষ্যতের সর্বদিক সুষ্ঠুরূপে গড়ে উঠবে। শিক্ষকদের আর্থিক অনটন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান একটি বিরাট সমস্যা। কারণ শিক্ষকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যে বেতন পান, তা অনেকের পরিবার নিয়ে চলার মত নয়। শিক্ষকেরা এই সমাজেরই বাসিন্দা। সমাজে আরও পাঁচজনের সঙ্গে তাদের বসবাস করতে হয়। তাদেরও আরও পাঁচজনের মত ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী এবং পরিজন আছে। তাদেরও অন্যদের মত ন্যূনতম চাহিদা আছে। আজকের দিনে শুধু তেঁতুল পাতার পানি বা ঝোল খেয়ে ক্ষুধা মেটে না। তাই ভোগ বিলাসের দিকে না ছুটলেও, ন্যূনতম চাহিদা থেকে তা আর বাদ দেওয়া যায় না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বিভাগ দুর্নীতির আখড়া বলে অভিহিত হলেও, সরকারি দেওয়া বেতনে সাধারণ শিক্ষকদের, গাড়ী বাড়ি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আজ সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বা প্রাপ্য আদায়ের জন্য সাধারণ শিক্ষকদের (প্রাথমিক শিক্ষকদের) রাস্তায় নামতে হচ্ছে। আর তার পরিণামে সামাজিক শ্রদ্ধার বদলে জুটছে লাঠি, টিয়ার গ্যাস এবং নির্যাতন ইত্যাদি। ফলে শিক্ষকগণ তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। এসব কারণে, শিক্ষকদের শিক্ষাদানের প্রতি মনোযোগও থাকে না। দৃষ্টি থাকে অর্থ উপার্জনের দিকে। তাই, যদি শিক্ষকদের এ সমস্যা এবং অভাব পূরণের ব্যবস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের কর্তৃক নেওয়া হয়, তা হলে এই বিরাজমান সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হওয়া সম্ভব।

সব সময় সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, শিক্ষা উন্নয়নের চাবিকাঠি। আর শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের কর্ণধার এবং উন্নত জীবনের পথ প্রদর্শক। তাই শিক্ষাদানে থাকবে, 'জীবনের সাথে সম্পর্কিত মানসম্মত বিদ্যা শিক্ষা কার্যক্রম'। এতে থাকবে অর্থবহ প্রতিযোগিতা এবং উৎসাহব্যঞ্জক কার্যক্রম। থাকবে না কোন দলাদলি, হানাহানি, বৈষম্য এবং কোন প্রকার দুর্নীতি। সকল দিক থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাখতে হবে স্বচ্ছ, সহজ, সরল, সাবলীল এবং কলুষমুক্ত। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে স্নেহ এবং মৈত্রীর সেতুবন্ধন। সকল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি থাকবে সমান দৃষ্টি। এক কথায়, সব অনাচার থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

আজ প্রয়োজন, প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে, বাস্তবভিত্তিক উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে কর্মসংস্থানসহ জাতীয় সমাজ গঠন করা, যা দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষার সমাহার ঘটানো যাবে, সমাজের প্রতিটি স্তরে। এটা করতে হলে, অবশ্যই দেশের বিদ্যমান সকল শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় করে, উন্নত বিশ্বের অনুকরণে পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়াসমূহ বাস্তবায়ন করা। যা শিক্ষণ এবং শিখন পরিবেশ সঠিকভাবে উন্নতি করে, এতে বিশেষভাবে যা প্রয়োজন, তা হলো চরিত্রবান, সৎ, সাহসী, উদ্যমী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্বের।

পরিশেষে এটা জোর দিয়ে বলা যায়, যদি সর্বোচ্চ স্তরে নিবেদিতপ্রাণ, যোগ্য নেতৃত্ব এবং দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা আর আন্তরিক কর্মচারী পাওয়া না যায়, তাহলে সত্যিকার উন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়।

আজ নতুনকে আবশ্যিকভাবেই জন্ম নিতে হবে এবং পুরানোকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিলে চলবে না। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ভারসাম্য ও ছন্দোময়তা স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বের লক্ষ্য, সর্বোপরি পৃথিবীর ভাল অর্জন করা যায়। যদি মন স্বচ্ছ এবং উর্বর হয় এবং তা সুন্দরভাবে অনুভুতি এবং ইচ্ছার ক্রিয়াশীলতার সাথে সংযুক্ত হয়, তাহলে জীবনভর উন্নতি ও বিকাশের প্রবল সম্ভাবনা থাকে। স্ব-শিক্ষা তখন আমাদেরকে চিন্তাধারার এক নতুন রাজ্যের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

সামন্ত ভদ্র
শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং কৃষি উপদেষ্টা

ফ জ লু ল হ ক

টেকসই উন্নয়নের মূলকথা-সাক্ষরতা আর দক্ষতা

ভূমিকা: সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও নিরক্ষরমুক্ত দেশ গড়ার প্রত্যয়ে আজকের এই দিবসটি সকলের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এমনকি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও এই দিবসের গুরুত্ব এবং তাৎপর্যের কথা সর্বজনবিদিত। জাতিসংঘ ও ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বের সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এই দিবস উদযাপন করা হয়। এ বছর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য হলো Literacy & Sustainable Development, যার বাংলা ভাষান্তর করা হয়েছে 'সাক্ষরতা ও টেকসই উন্নয়ন'। সাক্ষরতা হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার ও জীবনব্যাপী শিক্ষার মূলভিত্তি। যদিও বিষয়টি দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য একটি সাংবিধানিক স্বীকৃতি। ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জনের শেষ পর্যায়ে অবস্থান করছি আমরা। এই কর্মসূচির প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র শিক্ষা সম্পর্কিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছি। যদিও এই অর্জন অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা ও বেদনা-বিধুর স্মৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের ভাবনা: মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সাক্ষরতা অপরিহার্য একটি জরুরী বিষয়। সাক্ষরতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা বিকশিত হয় এবং পরিস্ফুটিত করে তার পরিপক্কতা ও পেশাদারিত্ব। সাক্ষরতার সংস্পর্শেই মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিটি মানুষই উন্নয়নের সকল শাখায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। ফলে দেশ ও সমাজ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলে। আর এটাই হল স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। শুনতে ভাল লাগে যে, আমাদের দেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে যে, সময়মতো কী সেই লক্ষ্য অর্জিত হবে? আবার অর্জিত সাফল্য কী ধরে রাখা যাবে? সময়মতো সেই লক্ষ্য অর্জন ও সফলতা ধরে রাখার জন্য দেশের বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে (প্রায় ৬ কোটি) সাক্ষরতা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। জীবন দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি মানসম্মত শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের দিকে নজর দিতে হবে। সেই সাথে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে কারিগরি ও পেশাভিত্তিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করতে হবে।

সাক্ষরতা আন্দোলন ও আমরা: আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট এগিয়েছে। বলতে গেলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় মেয়েদের সম্পৃক্ততা ঈর্ষণীয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র শিক্ষা সম্পর্কিত লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তের পরে ছাত্র-ছাত্রীদের পরবর্তী শিক্ষা কার্যক্রমে ধরে রাখতে ততোটা সফলতা অর্জন করতে পারিনি আমরা। শিক্ষাব্যবস্থায় যেমনি অনেক অর্জন আমাদের রয়েছে, তেমনি

রয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা। যদি মানসম্মত শিক্ষার কথা বলি তবে আমরা হোচট খাব। অর্থাৎ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আমাদের ব্যর্থতা ও অর্পযাপ্ততা এখনো রয়েছে।

এমনকি উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায়ও মানসম্মত শিক্ষার বিষয়টি প্রশ্নাতীত নয়। যদিও সরকারী-বেসরকারী প্রায় অর্ধ-শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে আমাদের দেশে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী-বেসরকারী অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, সুযোগ-সুবিধার পর্যাপ্ততাসহ উন্নয়ন অনুপাতে শিক্ষা কেন মানসম্মত হচ্ছে না, এই বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। সফলতা বলি-আর ব্যর্থতাই বলি, সাক্ষরতার হারই শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে। এহেন প্রেক্ষাপটে আসুন আমরা সকলে মিলে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের মূল প্রতিপাদ্যের আলোকে সকলেই সংশোধিত হই। দেশটাকে গড়ে তুলি সেভাবে, যেভাবে মহান স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশটিকে দেখতে চেয়েছিলেন।

শরীয়তপুরের সক্ষরতার চিত্র: অতি প্রাচীনকালে জেলার ধানুকা এলাকায় একটি সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। যদিও তার কোন অস্তিত্ব নেই। বিষয়টি শুনে অনেকেই হয়তো হতবাক হবেন যে, বলে কী লোকটি? যাই হোক, জেলাটি অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক জেলার তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। ঝরে পড়ার হারও অন্যান্য জেলার তুলনায় কম। মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের রেজাল্ট হতাশাব্যঞ্জক নহে। উচ্চ মাধ্যমিক ও গ্রাজুয়েশন পর্যায়ে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না থাকায় ও রাজধানী ঢাকা নিকটবর্তী হওয়ায়, প্রথাগত ভাবেই অনেকেই ঢাকা-নির্ভর। তবে জেলার সকল উপজেলা পর্যায়েই সরকারী-বেসরকারী একাধিক কলেজ রয়েছে। অত্র জেলায় একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত হওয়ায় অনেকেই সেখানে তাদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতকরণের সুযোগ গ্রহণ করছে। এছাড়াও, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ইনষ্টিটিউট সহ নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এই জেলায়। কিন্তু বিবেচনার বিষয় এই যে, এলাকাটি একটি দুর্যোগপ্রবণ। তাই দুর্যোগের সময় যেন শিক্ষা কার্যক্রম যেন ব্যাহত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আরো উল্লেখ্য যে, জেলার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নেই কোন রাজনৈতিক সংঘাত ও সংঘর্ষ। উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সর্বত্রই বিরাজমান। এখন শুধু সামনের দিকে পথচলা। দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব পেলেই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে হয়তো। সুতরাং আসুন, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপযুক্তভাবে তৈরি করে সকলেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকরী ও অর্থবহ অবদান রাখি।

পরিশেষে, বেসরকারী উন্নয়ন উদ্যোগ তথা এনজিও-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের কথা না বললে জেলার সমগ্র সাক্ষরতা ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্রের চিত্রায়নের অপূর্ণ থাকবে। অনেক এনজিওই প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজ করছে।

আমরা, ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের শেষ বর্ষে পর্দাপণ করতে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের বয়স্ক সাক্ষরতা তথা শিক্ষার হারের চিত্র অত্যন্ত নাজুক ও লজ্জাকর। জেলার বিরাট জনগোষ্ঠী নিরক্ষর, তাদের মধ্যে সিংহভাগই নারী। ইদানিং প্রযুক্তির উন্নয়ন, বিকাশ, সম্প্রসারণ ও ব্যবহার অতি দ্রুত। এই প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে উপযুক্ত হিসেবে আমরা তৈরি করতে পেরেছি কী? প্রশ্নটি পলিসি পর্যায়ের জন্য রেখে দিলাম।

শিক্ষার উন্নয়নে সরকারী কর্যক্রমের ভূমিকা: প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার গতিশীলতা আনয়নে বর্তমান সরকার, ইতোমধ্যেই বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে-যার ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প ১ ও ২ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

প্রকল্প-৩ প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নকে বহু ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। বিশেষ করে, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ভূমিকা অপরিসীম। বিগত বছরগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে, এমনকি নিয়োগ পরবর্তী প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের চাকুরির মান উন্নয়ন হয়েছে। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। এই ধারা যেন অব্যাহত ও অবিরত প্রচেষ্টা থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার সম্প্রসারণে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমান সরকার অধিকতর মনোযোগী ও আন্তরিক। উপজেলা পর্যায়ের কমপক্ষে একটি স্কুল সরকারী করণের চেষ্টা রয়েছে। তেমনি ভাবে উপজেলা পর্যায়ে অন্তত একটি কলেজকে জাতীয়করণের উদ্যোগ বিবেচনাধীন। জেলা পর্যায়ে যেখানে ১০০ বেডের হাসপাতাল রয়েছে তার সন্নিকটে বেসরকারী মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং নার্সিং ইনষ্টিটিউশন স্থাপনে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরী করা হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। উদ্যোক্তা ও পলিসি পর্যায়ের বিশেষ নজর দিতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই কার্যক্রম গ্রহণ না করলে জাতি অচিরেই মেধাশূন্য হয়ে পড়বে। সকল রাজনৈতিক দলকে এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। কেননা রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রতিশ্রুতি না থাকলে এই কার্যক্রম সুফল বয়ে আনতে পারবে না।

শিক্ষার অতীত ইতিহাস: ১৯৭১ সনে পাকিস্তানী হানাদাররা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়েছিল, হত্যা করেছিল আমাদের সম্মানিত শিক্ষকদেরকে, ধ্বংস করেছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে। সেই হানাদারদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করে আজ আমরা একটা স্বাধীন-সার্বভৌম দেশে বাস করছি। তখন থেকেই দেশ একটু একটু করে এগোচ্ছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই। পাশাপাশি বলব শিক্ষাব্যবস্থাও প্রাণবন্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, দক্ষিণ এশিয়ার আমরাই শিক্ষা ব্যবস্থায় সবার তুলনায় এগিয়ে। সর্বোপরি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা আমরাই অর্জন করতে পেরেছি। উন্নয়নের মডেল হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি মিলেছে বাংলাদেশের।

জর্জরিত শিক্ষাব্যবস্থা: বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশে রয়েছে বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা। আমরা চাই ২০১৫ সালের ভিতরে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন। কিন্তু যারা এই গুরুদায়িত্ব পালন করছেন, তাদের গুণগতমান বৃদ্ধির বিষয়টি উপেক্ষিত ও অবহেলিত। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক নানা সীমাবদ্ধতা যেমন: অবকাঠামো স্বল্পতা, আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অপর্যাপ্ততা এবং ক্লাস রুমে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত সঠিক ভাবে না থাকা-সহ বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মেয়ে শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে পারছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক সহিংস ও দলীয় আধিপত্য বিস্তার উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিকীকরণ থেকে বাঁচতে হবে। রেজাল্টনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে কারিগরি, পেশাভিত্তিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন, শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা গ্রহণসাপেক্ষে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সকলকে মনযোগী হতে হবে।

দারিদ্র্য আমাদের প্রধান সমস্যা। আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে বড় বাধা। পর্যাপ্ত পরিমাণে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে পেশাদারিত্ব ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা থেকেই যাচ্ছে। সুতরাং বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্ব এখন প্রযুক্তি-নির্ভর। আর তাই প্রযুক্তি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকলে আমরা অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবো না। স্থানীয় পর্যায়ে ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। আর তাই উপজেলা পর্যায়ে কমপক্ষে দুটি প্রাথমিক স্কুল, একটি করে বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং একটি করে কলেজকে মডেল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করতে হবে, যা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলে রাজধানী ঢাকায় যাওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাবে ও শহরের উপর বাড়তি জনসংখ্যার চাপ কমবে। আমাদের দেশে অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু হাতে গোনা দু-একটি ছাড়া অধিকাংশই নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান। কঠোর নজরদারি, বিশেষ পরিবীক্ষণ ও সহায়ক অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ করে এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে উপযুক্ত ও মানসম্মত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করাই এখন আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

করণীয় ও আমাদের ভাবনা: আমাদের সীমাবদ্ধতা গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাথায় রেখে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্যই প্রথমেই চিহ্নিত সমস্যাসমূহের সমাধান করতে হবে।

১. ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত রক্ষায় জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশের আলোকে উদ্যোগ নিতে হবে।

২. প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, ক্রমবৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্যের বিষয় বিবেচনায় রেখে সরকারীভাবে সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. শিশুদের মানসিক চাপ হ্রাসকল্পে সেমিষ্টার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

৪. প্রাথমিক পর্যায়ে কমপক্ষে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছয় জন শিক্ষক থাকা আবশ্যক।

৫. পর্যাপ্ত পরিমাণে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৬. অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষাগত ইনক্রিমেন্ট ব্যবস্থার প্রবর্তন ও অনুশীলন করতে হবে।

৭. শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যবধান কমাতে হবে।

৮. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে শিক্ষাব্যবস্থাকে একীভূত করতে হবে।

৯. জেলা পর্যায়ে কমপক্ষে ১টি করে বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।

১০. ক্রমবিকাশমান আমাদের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের ভূমিকা অনেক। সুতরাং উপজেলা পর্যায়ে ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের বিষয়টিকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

১১. সর্বোপরি, টেকসই উন্নয়ন ও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার মানষে জরুরিভাবে কম্পিউটার সাক্ষরতা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় নিয়ে বিষয়টিকে জরুরিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

১২. দারিদ্র্য ও বৈষম্যের শিকারে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপরোক্ত সমস্যগুলোকে প্রতিবন্ধকতা ধরে জাতিকে মানসম্মত শিক্ষা উপহার দেবার লক্ষে শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, যথাযথ মর্যাদা, পেশাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে সবার জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। সর্বোপরি, জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকারসহ সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

কর্মমুখী শিক্ষার বিকল্প নেই: বাংলাদেশ বিশ্বের দারিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এখানে সমস্যা অনেক। তাই মৌলিক সমস্যার সমাধানে কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকেও প্রাধান্য দিতে হবে। অর্থাৎ বাস্তবমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন এখন জরুরী। দেশের দারিদ্র লাঘবের জন্য কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। প্রযুক্তির এই দুনিয়ায় এই বিষয়টিকেও বিবেচনায় নিতে হবে।

কিছু প্রস্তাবনা: বিশ্বায়নের এই যুগে শিক্ষা হলো উন্নয়নের একমাত্র অবলম্বন। আর শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করতে শিক্ষকরা হালের বৈঠা নিয়ে লক্ষ্যে পৌছানোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই শিক্ষকদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টিকে বিবেচনায় নিতে হবে।

১. ভাল শিক্ষককে ধরে রাখতে প্রয়োজন বিভাগীয় পদোন্নতি ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।

২. বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থাকে একমুখী করার এখনই উপযুক্ত সময়।

৩. ৮ বৎসর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ঘটাতে হবে।

আসুন ২০১৫ সালের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষার জন্য সর্বোপরি দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে সফল করার জন্য সর্বাগ্রে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, কারিগরি ও ট্রেড-নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করি, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরি ও উহার কঠোর অনুশীলন নিশ্চিত করি, মানব উন্নয়ন কেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করি এবং সর্বোপরি শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক মানমর্যাদা বাড়াতে আন্তরিক, কার্যকরী ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করি। তবেই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হবে। পূরণ হবে দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ও অভিলাষ।

সকলের সম্পৃক্তি আবশ্যক: শিক্ষার মান উন্নয়নে সকল শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে এবং এর বাস্তবায়নে ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তবেই সাফল্য আসবে।

ফজলুল হক
সহযোগী অধ্যাপক
শরীয়তপুর সরকারী কলেজ

[আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে শরীয়তপুর-এ ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে আয়োজিত সভায় মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়]

পাঠক-লেখক-শুভানুধ্যায়ী *সমীপেষু–*

সাক্ষরতা বুলেটিন-এর প্রকাশনার প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আপনাদের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষণা। আর তা আমরা বিরতিহীনভাবে পেয়েছি বলেই বুঝতে পারি, এই ক্ষুদ্র পরিকল্পনার যে প্রাথমিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ সাক্ষরতা, অব্যাহত শিক্ষা এবং জনসচেতনতা সৃজনে সহায়তা– তার কিছুটা হলেও পূরণ হয়েছে। আমরা আপনাদের সঙ্গে নিয়ে, আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আরো এগিয়ে যেতে চাই।

তাই আগামী সংখ্যা থেকেই আমরা যুক্ত করতে চাই একটি নিয়মিত বিশেষ বিভাগ,– 'পাঠকের পাতা'। এই পাতায় আমরা প্রকাশ করতে চাই *বুলেটিন* সম্পর্কে আপনাদের বিভিন্নমাত্রিক অভিমত, প্রত্যাশা এবং শিক্ষা-সাক্ষরতার সেইসব দিক সম্পর্কে আপনাদের ভাবনা, যা হয়ত আমরা এখনো এই প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি। আপনাদের সমালোচনাও আমাদের পাথেয় হয়ে উঠবে। যদি কলেবরের ওপর প্রবল চাপ না পড়ে তাহলে আপনাদের পূর্ণাঙ্গ অভিমত আমরা কেবল ভাষাগত সম্পাদনাসহ ছেপে দেবো।

অধিকন্তু, এই কয়েক বছরে আমাদের পত্রিকা পাঠ করে আপনারা যে ধারণা অর্জন করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি স্থানীয় কোন শিক্ষা-সমস্যা ও সম্ভাবনাভিত্তিক লেখা পাঠান, তা প্রকাশ করতেও আমরা বিশেষভাবে আগ্রহী। লেখার সঙ্গে ছবি পাঠালে তাও আমরা মুদ্রিত করতে চাই। এ বিষয়ে আপনাদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা কামনা করি।

সম্পাদক

শ ফি আ হ মে দ

শেকস্‌পীয়রের ছোঁয়া

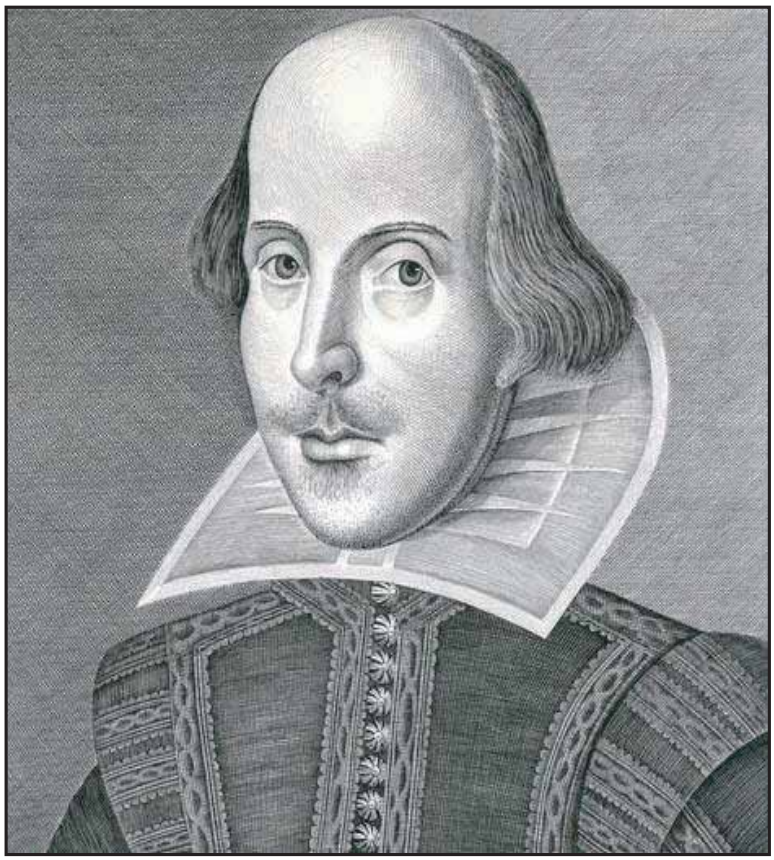

শিক্ষকতার পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করেছি। প্রায় চার দশক ধরে প্রতি বছর শেকস্‌পীয়রের নাটক পড়িয়েছি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। এমন অভিজ্ঞতা এবং পেশাগত পাঠদানের পুনরাবৃত্তি থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমার সবচেয়ে বড় অর্জন হল, একই নাটক বার বার পাঠের মাধ্যমে নিজেই বহুমাত্রিক অর্থ আবিষ্কার করেছি; শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করেছি, তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার পুনরাবিষ্কারের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আনন্দ ও শেকস্‌পীয়রের শোলক সন্ধানে মহাসড়ক থেকে বিভিন্ন অলি-গলির ঠিকানা পেয়ে যাবার যে তৃপ্তি, তা অনেক সময়ই বাঘা বাঘা সব সমালোচক বা তাত্ত্বিকদের আলোড়ন বইয়ে দেয়া গ্রন্থপাঠের চমককেও ছাড়িয়ে গেছে। তাই মনে হয়, কিছু স্মৃতির উল্লেখকে বিনয়ের ঘাটতি বলে চিহ্নিত করা যাবে না।

এখন থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। ১৯৬৪ সাল। শেকস্‌পীয়র সম্পর্কে কোন আলোচনায় এই সালের আলাদা মাহাত্ম্য বিষয়ে আলাদা করে বলার কিছু নেই। আমার বয়সী যাঁরা অথবা আর একটু জ্যেষ্ঠ, তাঁরা সবাই ১৯৬৪ সালে, শেকস্‌পীয়রের চার শত জন্মবার্ষিকীর বিভিন্ন আয়োজন সম্পর্কে অনেক কথাই হয়ত স্মৃতির ঝাঁপি ঘেঁটে বার করতে পারবেন।

১৯৬৪ সালে আমি স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্র। ইংরেজি বিষয়ে সম্মান শ্রেণীতে পড়ার এক ধরনের বাড়তি কদর ছিল এখন থেকে পাঁচ দশক আগে। ওই বছরই এই মহানাট্যকারের চারশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সম্মান শ্রেণীর আনকোরা শিক্ষার্থী হিসেবে শেকস্‌পীয়র সম্পর্কে তখনো ভালভাবে জানার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তো তাঁর উল্লেখ বা নাম উচ্চারণ করতে শুনেছি আমাদের মাস্টার মশাইদের। কোন কোন শিক্ষকের চেহারার মধ্যেই একটা রাশভারী ব্যাপার ছিল। যাদের চেহারাটায় অমন কোন নির্দিষ্ট ছাপ ছিল না, তারাও কিন্তু বেশ পণ্ডিতি ভাব দেখাতেন।

সবজান্তা সেইসব শিক্ষকরা মাঝে মাঝে যখন প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বা শেকস্‌পীয়রের নাম উল্লেখ করতেন, তখন তাঁদের কণ্ঠে এমন বিগলিত ধারায় বিশেষণ ঝরে পড়ত যে, এমন সব ভীতি-উদ্রেককারী মাস্টারমশাইদের কেমন খুবই ক্ষুদ্র বা বামন বলে মনে হত। নাম উচ্চারণ করার আগেই পারলে মাথা নুইয়ে ফেলেন, সেই শেকস্‌পীয়র যে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার কোন ব্যক্তি নয় তা তাঁদের কথা থেকেই বুঝতে পারতাম। তাঁরা এমনভাবে এই মহান নাট্যকারের কথা বলতেন যে, তার মধ্যে শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্য ঝরে পড়তো। ভাবখানা এরকম ছিল যে, শেকস্‌পীয়র পড়ার জন্য অথবা তাঁর রচনা বোঝার জন্য যে 'এলেম' থাকা দরকার, সেটা অন্তত এই জন্মে আমাদের কারো পক্ষে অর্জনযোগ্য নয়।

শেকস্‌পীয়র পাঠ করতে গিয়ে নানা বিষয়ের উন্মোচন যখন আমাকে থেকে থেকেই উত্তেজিত করেছে, তখন স্কুলের ওই মাস্টারমশাইদের কথা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে আমার মনে।

সপ্তম শ্রেণীর যে বাংলা দ্রুতপঠন গ্রন্থটা ছিল (সঠিক শিরোনামটা এখন আর মনে নেই) তার মধ্যে শেকস্‌পীয়রের 'ভেনিসের বণিক' এবং 'জুলিয়াস সীজার'-এর সহজপাঠ্য ভাষ্য ছিল। কৈশোরের সেই অভিজ্ঞতা এখনও শিহরিত করে আমাকে। শাইলকের প্রতি বিরাগ; সত্যিই কি এন্টোনিও-র বুকের কাছ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেয়া হবে এবং সবশেষে পোর্শিয়ার বুদ্ধিমত্তায় মধুরেণ সমাপয়েৎ আমাদের খুব তৃপ্তি দিয়েছিল, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

জুলিয়াস সীজার-এর সংক্ষিপ্ত বাংলাভাষ্য পড়ে সীজারের জন্য কষ্টটার চেয়ে ব্রুটাসের প্রতি ক্ষোভটা অনেক বেশি হয়েছিল, তা স্পষ্ট মনে পড়ে। বাড়িতে একটা খুব ছোট অক্ষরে ছাপা শেকস্‌পীয়রের রচনাসমগ্র ছিল। ক্ষুদ্রাকার অক্ষরের দিকে তাকিয়ে, পড়ার জন্য কোন শক্তি সংগ্রহ করা তো দূরের কথা, বইটাকেই প্রায় সম্ভ্রমযোগ্য, সালামযোগ্য বলে মনে হত। বাবা কখনো কখনো এমন আশ্বাস আর ইচ্ছার কথা বলতেন যে, বড় হয়ে আমি যেন মন দিয়ে এই নাট্যকারের রচনা পড়ি। তাঁর সেই ইচ্ছার মধ্যে খুব জোর ছিল বলে মনে হয় না।

ছোটবেলায় মঞ্চে তাঁর নাটক দেখার কোন সুযোগ হয়নি। স্কুলে যেসব বই পড়তে হত, তার সঙ্গে শেকস্‌পীয়রের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ওই যখনই ভাল ইংরেজি জানার প্রশ্ন আসতো, বলা হত এই নাট্যকারের কঠিন লেখা বুঝতে পারলে তবেই ইংরেজি জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়। এইসব থেকে এমন বোধ জন্মেছিল যে, আহা, ইনি হিমালয়ের মত উঁচু মাপের কবি-নাট্যকার।

চারশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলেজে শেকস্‌পীয়রকে নিয়ে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে, সেজন্য কর্তৃপক্ষ কত টাকা বরাদ্দ দিয়েছিল জানি না, কিন্তু আমাদেরও বলা হল কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে; ব্যক্তিগতভাবে সকলেই একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা তো দেবেই, পারলে অন্যদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে আনতে হবে। (সেযুগে অবশ্য আজকের মত চাঁদাবাজির কোন মন্দ ধারণা গড়ে ওঠেনি।) দেখা গেল, আমি অন্যান্য সহপাঠীদের চেয়ে বেশি টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। কবুল করতে দ্বিধা নেই, শেকস্‌পীয়র-অনুরাগ তার মূল কারণ ছিল না, মূল প্রণোদনা ছিল প্রতিযোগী বন্ধুদের টপকে যাওয়া।

যাই হোক. এর পর একদিন বেশ সাহস সঞ্চয় করে এবং সবিনয়ে আমাদের অধ্যাপক ঘোষালকে জিজ্ঞেস করলাম, মহোদয়, এই যে ব্যক্তিকে নিয়ে আমরা এত হাজার মাইল দূরে এত মাতামাতি করছি, এতটাই কি সত্যি তাঁর প্রাপ্য? বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অধ্যাপক ঘোষাল বেশ শিক্ষার্থী-বান্ধব ছিলেন। প্রথম বর্ষে কবিতার কোর্সে দু'টি সনেট বাদে শেকস্‌পীয়রের ওই *জুলিয়াস সীজার* আমাদের পাঠ্য ছিল। অধ্যাপক ঘোষাল ওই নাটকটা খুবই চমৎকার নাটকীয় ভঙ্গিতে আমাদের পড়াতেন।

যাই হোক, আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তিনি কয়েক সেকেণ্ড সময় নিলেন। তারপর আমাকেই পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন, আচ্ছা ওই যে হাওড়ায় গেস্ট কীন উইলিয়মস নামে একটা (তখনকার দিনের বিচারে অনেক বড় একটা শিল্প-প্রতিষ্ঠান) শিল্প কারখানা আছে, সেখানে কত লোক কাজ করে? স্যারের প্রশ্নের আকস্মিকতায় আমি প্রাথমিকভাবে হতবিহ্বল বোধ করছি। আমতা আমতাভাবে বললাম, তা হাজার পাঁচেক হতে পারে। উত্তর মোটামুটিভাবে ঠিক হয়েছে জানিয়ে অধ্যাপক ঘোষাল বললেন, 'তা আমাদের এই উইলিয়ম শেকস্‌পীয়র তাঁর মৃত্যুর পরও কম-বেশি হাজার পাঁচেক মানুষের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন'। ক্লাসের সবাইয়ের চোখ তখন অপলক, মুখ হাঁ। সবাই স্বাভাবিকভাবেই স্যারের ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা করছি।

তিনি বললেন, এই যে দুনিয়া জুড়ে আমাদের মত লাখ লাখ ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষার্থী রয়েছে, শুধু তাদের জন্য শেকস্‌পীয়রের নাটকের যত কপি ছাপতে হয় এবং সঠিক হিসেব নিলে দেখা যাবে সেজন্য পাঁচ হাজারের বেশি কম্পোজিটর (সেকালে মুদ্রণব্যবস্থা আজকের মত আধুনিক ছিল না, লেটার প্রেসে সীসার অক্ষর দিয়ে শব্দ সাজানো হত।) প্রতিদিন নিয়োজিত আছেন। এরপর প্রেসের অন্যান্য কর্মী, বাঁধাইকার, বইবিক্রেতা ও শেকস্‌পীয়রের নাটক বিষয়ে পাঠদান করে মাস মাইনে পাওয়া শিক্ষককুল তো রয়েছেনই।

আমাদের জীবনে শেকস্‌পীয়রের অবদান বুঝতে গিয়ে এমন নির্দেশক যে ব্যবহার করা সম্ভব, আমাদের ওই বয়সে তা ছিল কল্পনার অতীত। স্যার, আর একটা মোক্ষম উদাহরণ দিয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে শেকস্‌পীয়রের চার শত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে হয়ত এমন কোন তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক জানা নেই আমার। অধ্যাপক ঘোষাল বললেন, তোমরা সবাই হিমালয় থেকে মাদ্রাজের (তখনও চেন্নাই বা তামিলনাড়ু হয়নি) সমুদ্রতীর পর্যন্ত ভারতবর্ষের সবটা অঞ্চলের বিশালত্ব কল্পনা করো, তার সঙ্গে যোগ করে নাও পাকিস্তান (তখন এই বাংলাদেশও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল)। এই সবটা অঞ্চল জুড়ে যে বিরাট ভূখণ্ড হবে, তার ওপর যদি এ পর্যন্ত মুদ্রিত, প্রকাশিত ও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত শেকস্‌পীয়রের নাটক বা তাঁর রচনা বিষয়ে প্রকাশিত সমালোচকদের গ্রন্থ বিছিয়ে দেয়া হয়, তা হলে নাকি এই ক'হাজার মাইল জায়গাও পর্যাপ্ত নয়, সম্ভবত আমাদের আফগানিস্তানের সীমানায় পাড়ি দিতে হবে। এত বড়ো ভূখণ্ডটাকে মাইলের হিসেবে কল্পনা করে একসঙ্গে দেখাটাই আমাদের জন্য খুব কষ্টসাধ্য কাজ ছিল, তার ওপরে নদী খাল বিল পাহাড়-পর্বত সহ তার জমিনে শেকস্‌পীয়রের রচনা বিছিয়ে দেবার সুবিশাল কসরৎ আমাদের কাছে তখন

হারকিউলিসের শক্তিমত্তার চেয়ে অনেক প্রবল ও দুঃসাধ্য বিষয় হিসেবে মনে হয়েছিল।

যাই হোক, ১৯৬৪ সালের আমার এই নতুন অভিজ্ঞান শেকস্‌পীয়র সম্বন্ধে মনের মধ্যে আলাদা একরকমের সম্ভ্রমের ভাব সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তার মধ্যে যতটা না ভীতি ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল বিস্ময়। কলেজের গ্রন্থাগারের ভেতরে ঢোকার অনুমতি ছিল না। কিন্তু ক্যাটালগে পাতার পর পাতায় উইলিয়াম শেকস্‌পীয়রের বইয়ের তালিকা দেখে চোখ আটকে গিয়েছিল। স্কুল ও কলেজের দিনগুলি থেকে অর্ধশতক পেরিয়ে এসে এই এখন বুঝতে পারি, আমার বাবা অথবা আমার শিক্ষকদের মধ্যে শেকস্‌পীয়র সম্পর্কে যে সুবিপুল শ্রদ্ধাবোধ ও সমীহ ছিল, তার সিংহভাগই ছিল এক ধরনের অন্ধ আনুগত্য।

গল্পকথার বাইরে নানা তীক্ষ্ম বা নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে শেকস্‌পীয়র পাঠ তাঁদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। খুবই সম্ভব যে, তাঁরাও তাঁদের শিক্ষক বা বয়োজ্যেষ্ঠজনদের কাছ থেকে শেকস্‌পীয়র সম্পর্কে বড় বড় সব কথা শুনে থাকবেন। কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও এর মধ্যে সম্ভবত ছিল, স্বাভাবিকসূত্রে, তাদের অচেতনে, অবচেতনে। ব্রিটিশ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শাসকদের যে প্রচার ও প্রচারণা ছিল, তার উৎকর্ষ বিষয়ে সেই কালের ব্রিটিশ অধ্যাপক অথবা তাঁদের শিক্ষার্থী যেসব দেশীয় বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ ছিলেন, তারা না জেনে বা সামান্য জেনে নির্বিবাদে ইংরেজি সাহিত্যের অপার সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন। এর একটা ধারাবাহিক প্রভাব বিশ শতকের পঞ্চাশ বা ষাটের দশক পর্যন্ত যে বিশেষ সক্রিয়ভাবে বহমান ছিল, তা প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায়।

যাই হোক, বড় একটা মধুর ধাক্কা খাওয়ার স্মৃতি রোমন্থন করতে চাই। এই যে তাবড়, এত বড়, সবচেয়ে বড় সাহিত্যশিল্পী শেকস্‌পীয়র সম্পর্কে ভারী ভারী উচুঁ উচুঁ শব্দ কানের মধ্যে প্রবেশ করে কিছুটা মরমেও পশিল, তার বিষয়ে উৎসাহ বুকে বন্দী করে একদিন পাড়ার লাইব্রেরীতে গেলাম। নাম ছিল 'মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী'। কিছুকাল আগেই ওই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সদস্যপদ নিয়েছি মাত্র তিন টাকা দিয়ে (সেযুগে সেটাও আমার জন্য বেশ কষ্টকর ছিল)। কিন্তু লাইব্রেরীয়ান কাকু বললেন, ছাত্র-সদস্যদের শেকস্‌পীয়রের বই দেয়ার নিয়ম নেই। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসও আমাদের অনুকূলে ইস্যু করার কোন নিয়ম ছিল না। পরে জেনেছিলাম, এসব গ্রন্থে নরনারীর এমনসব প্রেমের গল্প আছে, যা নাকি আমাদের মত বিদ্যালয়-শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ওই দিন থেকে একটা বিষয় আবশ্যিকভাবেই জেনে গেলাম যে, শেকস্‌পীয়র শিশু বা কিশোরদের জন্য সুখপাঠ্য তেমন কিছু লেখেননি। এই জ্ঞান আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতেও প্ররোচিত করলো যে, আমাদের রবীন্দ্রনাথ সেদিক থেকে বিচার করলে ওই ব্রিটিশ নাট্যকারের চেয়ে মহত্তর সাহিত্যিক।

একেবারে আকস্মিকভাবেই শেকস্‌পীয়রের উল্লেখ দেখতে পেয়ে একবার বেশ পুলকিত বোধ করেছিলাম। শংকর-এর লেখা একটা বড় উপন্যাস *চৌরঙ্গী*। সেকালে উপন্যাসটা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। পরে এই কাহিনী নিয়ে একটা বাংলা ছায়াছবিও নির্মিত হয়েছিল। মহানায়ক উত্তমকুমার সেটাতে অভিনয় করেছিলেন। বইটা পড়ার সময় দেখতে পাই, উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সত্যদা এক সংলাপে বলেছেন, তার বাবার ইচ্ছা ছিল, ছেলে বড় হয়ে রবীন্দ্রনাথের মত বাংলা, শেকস্‌পীয়রের মত ইংরেজি এবং তুলসীদাসের মত হিন্দি শিখবে। কিন্তু পরিণতিতে ব্যাপারটা একটু খিচুড়ি পাকিয়ে গেল, ছেলে তুলসীরামের মত ইংরেজি, রবীন্দ্রনাথের মত হিন্দি ও শেকস্‌পীয়রের মত বাংলা শিখল। রসসৃষ্টির মধ্য দিয়েও যা বেরিয়ে এল তা হল, শেকস্‌পীয়রের মত ইংরেজি শেখা, সে অতি বড় শক্ত কাজ। তা সাধন করা নেহাতই কষ্টসাধ্য'।

অবশ্য শেকস্‌পীয়রের ইংরেজি ভাষাজ্ঞান যে অতি উচ্চ ছিল, তা নিয়ে বর্তমান রচনার লেখকসহ তাঁর কোটি কোটি ভক্ত খুব উঁচু গলায় কথা বলেন না। তাঁর ভাষার যে শক্তি, সাবলীলতা, কাব্যিক গভীরতা, সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা এবং অভিজাতবর্গের চোস্ত শব্দসমষ্টি ইত্যাদির ব্যবহারে তার অসাধারণ মুন্সিয়ানা নিয়ে হাজারে হাজার গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ভাষায় পণ্ডিতিপনার শাস্ত্রীয় বিতর্ক তার জন্য প্রযোজ্য নয়। তাঁর জ্ঞানগম্যি নিয়ে কটাক্ষ করতে গিয়ে তারই সমসাময়িক এবং সহযোগী নাট্যকার বেন জনসন লিখেছিলেন, উনি গ্রীক বা লাতিন জানতেন যৎসামান্যই।

শেকস্‌পীয়রের কোন প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ নেই। তবে এটা নিশ্চিতভাবেই জানা যায়, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের সঙ্গে তাঁর তেমন কোন যোগ ছিল না। এক শ' বছর আগেও এমন গবেষকদের খোঁজ পাওয়া গেছে যে, তারা মনে করেন, শেকস্‌পীয়র নামে কোন নাট্যকার-লেখক-কবি আদৌ ছিলেন না। যেসব বইয়ের লেখক হিসেবে শেকস্‌পীয়রকে গণ্য করা হয়, সেগুলো আসলে তারই সমসাময়িক আর এক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ক্রিস্টোফার মার্লোর রচনা। মার্লোও ছিলেন একজন অত্যন্ত শক্তিমান নাট্যকার। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে অকালপ্রয়াত না হলে তিনি যে নাট্যসাহিত্যে অসাধারণ কীর্তির দাবিদার হতেন, তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবুও তিনি যে চারটি দীর্ঘ নাটক এবং নাতিদীর্ঘ কাব্য রচনা করেছেন, তা সত্যিই খুবই উঁচু মানের।

শেকস্‌পীয়রের চার শত জন্মবার্ষিকীর সময় নানাবিধ উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। তার অনেকটাই সাহিত্যিক এবং নাট্যমঞ্চায়ন-

জাত হলেও আলাদা আরো কিছু বিষয় ছিল। তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে শেকস্‌পীয়রকে নিয়ে ব্যবসা করার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। শেকস্‌পীয়রের অমর সব উক্তি সমাহারে ছোট ছোট সংকলন প্রকাশের মধ্য দিয়ে শেকস্‌পীয়রকে জনপ্রিয় করে তোলার চেয়ে যা বেশি সক্রিয় ছিল, তা হল গ্রন্থব্যবসা। নাট্যকারের ছবি দিয়ে চা ও কফি খাবার মগ, কলমের গায়ে তাঁর ছবির মুদ্রণ, এমনকি বিদ্যালয়-শিক্ষার্থীদের পেনসিল, রুলার, রাবার ইত্যাদিতে তার ছবির ব্যবহারের মধ্যে ব্যবসায়িক প্রবণতা বেশ দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল। নানারকমের কল্পকথা গল্পকথা সৃষ্টি হয়েছিল ওই সময়ে। তার মধ্যে একটা অবিস্মরণীয় হয়ে আমার স্মৃতিতে গেঁথে আছে। পাকিস্তানের (পশ্চিম) একটা মোটামুটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে একজন লিখলেন যে, শেকস্‌পীয়র আসলে মুসলমান ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম শেখ পীর। এই শেখ পীরই *হ্যামলেট, ম্যাকবেথ*-সহ বিখ্যাত সব নাটকের গ্রন্থকার। তার লেখা হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছানোর পর তাঁর নামটা বিকৃত করে ব্রিটিশরা শেকস্‌পীয়র নামে প্রচার করতে থাকেন। দারুণ এই তত্ত্ব সেদিন আমাদের বেশ আনন্দ দিয়েছিল।

আমাদের তরুণ বয়সে যে নাটকটা না পড়েও আমাদের মধ্যে বেশ ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়েছিল, সে হল, *রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট*। প্রেমের এক অমর কাহিনী। একজনকে না দেখিলে অন্যের হৃদয়ে প্রবল প্রদাহ সৃষ্টি হয়। রাস্তা-রোমিও বা Street Romeo বলে একটা ধারণা তখন বেশ প্রচলিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কমবয়সী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে প্রকাশ্য বা লুকানো মেলামেশার কোন চল তখন ছিল না। প্রেম আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে কোন কিশোরীর দিকে লুকিয়ে একটা চাঁপা ফুল ছুঁড়ে দেয়া, অথবা বইয়ের পাতার ভেতর কোন চিরকুটে অপটু হাতে আঁকা হৃদয়ের ছবি, এসবই ছিল তরুণদের সম্বল। কথা বলার সুযোগ না পেয়ে কোন তরুণ হয়ত বার বার হেঁটে যায় কোন তরুণীর বাড়ির সামনে দিয়ে, অথবা ব্যর্থ কোন তরুণ বিরসবদনে রাস্তায় একাকী ঘুরতে থাকলে, তাকে আমরা 'রোমিও' হিসেবে অভিহিত করতাম। সেজন্য শেকস্‌পীয়রের ওই নাটক বা তার কাহিনী জানার দরকার পড়ত না।

তারুণ্যের সমাপনে মধ্যবয়সে দ্বিতীয় বার ইতালি ভ্রমণের সময় গিয়েছিলাম ওই ভেরোনা শহরে। সেখানে বিরাট দূর্গ আছে, উঁচু চার্চ আছে, গ্রীক আর ইতালিয় স্থাপত্যের মিশেলে নির্মাণ করা উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চ আছে। কিন্তু আমারও দেখার ইচ্ছা ভেরোনায় সেই জুলিয়েটদের বাড়ি। নানা দেশের পর্যটক ছুটছে সেদিক পানে। জুলিয়েটের সেই বারান্দা, দেয়াল পেরিয়ে ভেতরের ছোট উঠোনে জুলিয়েটের মূর্তি। জুলিয়েটের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার জন্য কী মাতামাতি। কোনভাবেই এককভাবে জুলিয়েটের মূর্তির সঙ্গে ছবি তোলার কোন উপায় নেই। গ্রুপ ছবির একজন হয়েই থাকতে হবে, কাকে ঠেলে কতটা ভাল জায়গায় দাঁড়ানো যায় তার প্রতিযোগিতা। দারুণ কৌশলে একেবারে জুলিয়েটকে স্পর্শ করে ছবি তুলেছি। ওই ঔতিহাসিক বারান্দায় দাঁড়িয়েছি, তার শোবার ঘরে প্রবেশ করেছি। তথ্যপ্রযুক্তির এই কালে জুলিয়েটের বাসভবনের দোতলায় বসার ঘরে এখন কয়েকটা ডেস্কটপ রাখা আছে, ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া আছে, জুলিয়েটের ই-মেইল ঠিকানা দেয়া আছে, ভক্তরা জুলিয়েটকে চিঠি বা প্রেমপত্র লিখতে পারে। আমিও বয়সের তোয়াক্কা না করে একটা চিঠি লিখেছিলাম। উত্তর আসেনি, তেমন আশাও করিনি। জানি, এসবই বানানো, এই বাড়ি, বারান্দা, উঠোন, সবই শেকস্‌পীয়রকে নিয়ে বাণিজ্য। তবুও শেকস্‌পীয়রের রচনার নেশাগ্রস্ত পাঠ থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। জুলিয়েট ও রোমিও-র যুগল-কবর দেখতে গেলাম। মাটির অনেকটা নিচে নামতে হয়। শেকস্‌পীয়র পাঠের অদমনীয় প্রভাবে দুই প্রেমকাতর তরুণ-তরুণীর আত্মহনন প্রবলভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল আমাকে।

প্রথমবার যেবার কোপেনহেগেন যাই, যখন শুনলাম, হ্যামলেটের সেই এলসিনোর রাজপ্রাসাদ মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার দূরে, সেদিন সন্ধ্যা থেকেই ছটফট করতে থাকি। আগামীকাল প্রাতঃরাশের পর প্রথম কাজ এলসিনোরে যেতে হবে। শেকস্‌পীয়রের এলসিনোরের আসল নাম Helsingor। বিশাল প্রাসাদ। সমুদ্রতীর। প্রাসাদের অলিগলির শীতল পথ দিয়ে হাঁটলে যেন হ্যামলেটের পায়ের শব্দ শোনা যায়। এরও সবটাই মিথ। কিন্তু শেকস্‌পীয়রের যাদুটোনা থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

রোমে গিয়ে অনেক পরিশ্রম করে বের করেছিলাম ঠিক কোন জায়গাটায় সীজারকে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়েছিল। এমন অনেক সব জায়গায় ঘুরে গল্প ও কল্পকথার সীমানা স্পর্শ করার বিচিত্র ও পরম উত্তেজনা বোধ করেছি।

কিন্তু বেশ কয়েকবারই তো গেলাম শেকস্‌পীয়রের জন্মভূমি স্ট্র্যাটফোর্ড আপন আভনে। নাট্যকারের গন্ধ খুঁজতে কত হাজার মানুষ আসেন সেখানে। এখন আধুনিক কায়দার যাদুঘর হয়েছে, মিলনায়তন ও রঙ্গমঞ্চ হয়েছে। কিন্তু তিনি বুঝি শুধু দূর থেকে মুচকি হাসেন, বলেন, এসব শৌখিন জিনিস দেখতে থাকো, কিন্তু এসবই নকল, আসল কথা হল আমার রচনা, যদি পারো তা মন দিয়ে পড়ো, সেখানে পাবে সারা পৃথিবীর সব মানুষের মনের ঠিকানা।

শফি আহমেদ
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন কঠোর হচ্ছে: চুমকী

মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকী বলেছেন, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন কঠোর করা হবে। আইনে অপরাধীকে ২ বছরের কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার বাল্যবিবাহ রোধে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সচেতনতার অভাবে তা রোধ করা সম্ভব হয়নি। এজন্য বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন সংশোধন করে আরও কঠোর করা হচ্ছে। জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৪ উপলক্ষে বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম ও ডিবেট ফর ডেমোক্র্যাসি আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির সমাজ বিজ্ঞান এবং জেন্ডার স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের চেয়ারপার্সন ড. মালেকা বেগম, এনসিবিপির চেয়ারপার্সন সালমা খান, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সভাপতি ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি। ডিবেট ফর ডেমোক্র্যাসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

প্রতিমন্ত্রী চুমকী আরও বলেন, সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত গার্লস সামিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কন্যাশিশুর বিবাহকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে অভিহিত করে সমস্যা দূরীকরণের দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এ আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে তারই প্রতিফলন ঘটবে।

মেয়েদের বিয়ের বয়স কমিয়ে ১৬ বছর ও ছেলেদের ১৮ বছর করার প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করে ড. মালেকা বেগম বলেন, মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধেও উদ্যোগ নিতে হবে।

আলোকিত বাংলাদেশ ২.১০.২০১৪

বেইলি রোডের বিদ্যালয়ের মালিকানা ফিরে পেল সরকার

রাজধানীর বেইলি রোডের গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের জমিতে থাকা 'সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' ও মিরপুর-২-এ 'চম্পা পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়'- কে স্থানান্তরের হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।

গতকাল রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল শুনানি নিয়ে বিচারপতি এসকে সিনহার নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের বেঞ্চ এই আদেশ দেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা।

আদেশের পরে মুরাদ রেজা সাংবাদিকদের বলেন, আদালত মন্ত্রণালয়ের আপিলের আবেদন গ্রহণ করে হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেছেন। এর ফলে আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ওই স্থানটিতে বিদ্যালয়টির কার্যক্রম চলতে আর বাধা নেই বলে জানান তিনি। গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জায়গাটি নিজেদের বলে দাবি করে ২০০২ সালে তৎকালীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ স্কুলটি সরিয়ে নিতে চিঠি দেয়। পরে স্কুলটিকে পাশের নিধু স্মৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করার সিদ্ধান্ত হয়। এরপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের এ আদেশটি ২০০৮ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাতিল করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ওই বছরই মন্ত্রণালয়ের এ আদেশ চ্যালেঞ্জ করে গার্লস গাইড হাইকোর্টে একটি রিট দায়ের করেন। এ রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত মন্ত্রণালয়ের বাতিল আদেশটি স্থগিত করে রুল জারি করেন। রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে গত ২০ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট মন্ত্রণালয়ের আদেশ বাতিল করে সামাজিক শিক্ষা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পাশ্ববর্তী নিধু স্মৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করার আদেশ দেন। হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে ঈদের ছুটির মধ্যে ওই স্কুলে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। গত ৭ আগস্ট ছুটি শেষে শিক্ষকরা স্কুলে ফিরে দেখতে পান, তাদের বিদ্যালয় গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর খোলা আকাশের নিচেই ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন তাঁরা। এ নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের মধ্যেই ওই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে আপিল বিভাগে যায় রাষ্ট্রপক্ষ।

সমকাল ১১.১০.২০১৪

প্রাথমিক সব শিক্ষকের চাকরির মর্যাদা একই শ্রেণীভুক্ত করার দাবি

জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষকদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিবেচনায় নিয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের চাকরির পদমর্যাদা একই শ্রেণীভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষকরা।

গতকাল শনিবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে 'প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক সমিতি'র ব্যানারে আয়োজিত এক মানববন্ধনে তারা এ দাবি জানান।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সমিতির আহ্বায়ক নাসরিন সুলতানা, সদস্য সচিব শামছুদ্দিন আহমেদ, মিজানুর রহমানসহ রাজধানী ও দেশের বিভিন্ন প্রাইমারি স্কুলের শতাধিক শিক্ষক।

তাদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষকের এক ধাপ নিচের বেতন স্কেল নির্ধারণ, সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের সব শিক্ষককে সহকারী শিক্ষক হিসেবে পদায়ন করে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে পদোন্নতি, প্রধান শিক্ষকের শূণ্য পদে শতভাগ পদোন্নতি, সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা পরিবর্তন করে মহিলা ও পুরুষ নির্বিশেষে সবার শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি নির্ধারণ, মাসিক সমন্বয় সভা, উপজেলা, জেলা ও মহানগর শিক্ষা কমিটিসহ যাবতীয় কমিটিতে সহকারী শিক্ষক প্রতিনিধি রাখা, শিক্ষকদের রেশনিং, আজীবন চিকিৎসা বীমা এবং শিক্ষক পরিবারের জন্য চিকিৎসা কার্ডের ব্যবস্থা।

এ ছাড়া বিদ্যালয় পাঠদানের সময়সূচি ঢাকা মহানগরীতে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা এবং মহানগরের বাইরে সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত করা, নন-ভোকেশনাল ডিপার্টমেন্ট হিসেবে ঘোষণা করে শিক্ষকদের অর্জিত ছুটির বিধান প্রণয়ন করা ইত্যাদি।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, চলতি বছরের ৯ মার্চ প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা প্রদান ও সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল প্রধান শিক্ষকদের ৩ ধাপ নিচে নির্ধারণ করা হয়। যার ফলে প্রধান শিক্ষকরা যে বেতন স্কেলে চাকরি শুরু করেন; সহকারী শিক্ষকদের সেই স্কেলে তাদের চাকরি শেষ করতে হচ্ছে।

সমকাল ১১.১০.২০১৪

সামরিক খাতে ব্যয় না বাড়িয়ে শিক্ষা-স্বাস্থ্যে বৃদ্ধির তাগিদ

দারিদ্র্যের হার কমে আসা, গড় আয়ু বেড়ে যাওয়া, মাতৃ মৃত্যুরহার কমাসহ সামাজিক অনেক সূচকে সার্কভুক্ত অন্য দেশগুলোর তুলনায় বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। তবে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার এবং শৌচাগার ব্যবহারসহ অনেক সূচকে এখনো পিছিয়ে দেশ। সামরিক খাতে ব্যয় না বাড়িয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বেশি করে অর্থ বরাদ্দ দিলে পিছিয়ে পড়া সূচকেও এগিয়ে থাকা সম্ভব হতো বলে মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধূরী।

গতকাল রবিবার রাজধানীর শেরে বাংলানগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে 'সার্ক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা: ২০১৩'-এর প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, 'সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় না বাড়িয়ে সামরিক খাতে বাড়াচ্ছে, যা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না।' সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ানো প্রসঙ্গে কিছু না বললেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে যে আশানুরূপ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না তা স্বীকার করেছেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা

কামাল ও প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী। আগামী বাজেটে এই দুই খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে গতকালের অনুষ্ঠানে।

প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সদস্য ড. শামসুল আলম। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নানসহ সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সার্কভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতরা উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও একমাত্র ভুটানের রাষ্ট্রদূত ছাড়া আর কাউকে দেখা যায়নি।

রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) চেয়ে সার্ক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বেশি গুরুত্ব বহন করে। এসডিজিই বাংলাদেশের জন্য বেশি প্রাসঙ্গিক। এসডিজিতে দারিদ্র্য বিমোচন, জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ অনেক সূচকেই বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু আয়ের অসমতা, মহিলা শ্রমিকের অংশগ্রহণের হার, নারীর ওপর সহিংসতা, বাল্যবিবাহসহ কিছু সূচকে পিছিয়ে আছে।

গওহর রিজভী বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ খুব কম। এটি আরো বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, দেশ আগের অবস্থানে নেই। দারিদ্র্য কমেছে, জিডিপির প্রবৃদ্ধি গড়ে ছয় শতাংশ। গড় আয়ুও বেড়েছে। তবে ঝরে পড়া, নারীর প্রতি সহিংসতা, স্যানিটেশন সুবিধাসহ বেশ কিছু সূচকে দেশ এখনো পিছিয়ে।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০১১ সালের আলোকে সার্ক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে প্রতিবেদন তৈরি করেছে তার সমালোচনা করেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। তিনি বলেন, প্রতি বছরের তথ্য সংগ্রহ করে সেই আলোকে প্রতিবেদন তৈরি করা উচিত। তিনি বলেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সরকার সেই পথেই হাঁটছে। মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার না থাকায় ঝরে পড়া রোধ করা যাচ্ছে না। দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বাংলাদেশের গড় আয়ু, পয়ঃনিষ্কাশন, দারিদ্র্য বিমোচন, সন্তান জন্মের হারসহ বেশ কয়েকটি সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ সার্কভুক্ত অন্য দেশগুলোর তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। তবে ক্রয়ক্ষমতার সক্ষমতার ভিত্তিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বেশ পিছিয়ে আছে। পিপিপির ভিত্তিতে বর্তমানে দেশে মাথাপিছু জিডিপির আকার এক হাজার ৫৬৯ ডলার। সর্বোচ্চ জিডিপির আকার ভুটানের, পাঁচ হাজার ১৬২ ডলার। এ ক্ষেত্রে ভারতের তিন হাজার ২০৩ ডলার, পাকিস্তানের দুই হাজার ৪২৪ ডলার এবং শ্রীলঙ্কার চার হাজার ৯২৯ ডলার।

কালের কণ্ঠ ২০.১০.২০১৪

নানা আয়োজনে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন

নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে রাজধানীতে সোমবার বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে সকালে শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়। ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, এ্যাকশন এইড, গণসাক্ষরতা অভিযান, আমার অধিকার ক্যাম্পেইন, ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ও জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচির অংশ হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে সদ্যপ্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমেদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

দেশের প্রথম নারী উপাচার্য প্রফেসর ড. ফারজানা ইসলামকে সম্মাননা জ্ঞাপন এবং শিক্ষকদের পেশাগত অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রাখায় প্রয়াত চার শিক্ষক নেতা শেখ আমানুল্লাহ, অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান, চৌধুরী খুরশীদ আলম, অধ্যক্ষ এ কে এম জহিরুল ইসলাম ও শিক্ষা প্রসারে অবদানের জন্য নজির আহমেদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস জাতীয় উদ্‌যাপন কমিটির সমন্বয়ক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাবি'র উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধূরী, ইউনেস্কো ঢাকা কার্যালয়ের প্রোগ্রাম স্পেশালিষ্ট কিচি ওয়াসু প্রমুখ।

ইত্তেফাক ২১.১০.২০১৪

লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে এগিয়েছে বাংলাদেশ

অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও সুযোগ বাড়ানোর মধ্য দিয়ে লিঙ্গবৈষম্য কমিয়ে এনেছে বাংলাদেশ। এমনকি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশ্বের শীর্ষ দশেও উঠে এসেছে এ দেশটি। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডাব্লিউইএফ) 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৪'-তে এ চিত্র ফুটে উঠেছে।

গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৬ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে এসে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠায় সার্বিকভাবে বেশ ভালো উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। ২০১৪ সালের এ সূচকে বিশ্বের ১৪২ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৮তম স্থানে উঠে এসেছে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৫তম এবং ২০১২ সালে ছিল ৮৬তম। লিঙ্গ অসমতা সূচক তৈরি করা হয়েছে চারটি ভিত্তির ওপর। বিষয়গুলো হচ্ছে স্বাস্থ্য এবং বেঁচে থাকা, শিক্ষায় অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক সুযোগ এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সুযোগ, শিক্ষায় অর্জন এবং স্বাস্থ্য খাতেও উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৭তম, শিক্ষায় ১১১তম। বলা হয়, লিঙ্গবৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এশিয়ার অন্যতম এগিয়ে যাওয়া দেশ। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি সেকেন্ডারি শিক্ষায়ও নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১২২তম। তবে বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো সাফল্য দেখা যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। এতে বাংলাদেশের অবস্থান ১০তম। বলা হয় গত ২১ বছর ধরেই বাংলাদেশে নেতৃত্ব দিচ্ছে নারী। তবে নারীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা বা কোনো প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্তা হওয়ার দিক থেকে বাংলাদেশ এখনও পিছিয়ে।

বৈশ্বিক এ তালিকায় শীর্ষ পাঁচে রয়েছে আইসল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্ক। এতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ২০তম স্থানে। এক বিবৃতিতে ডাব্লিউইএফের প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী চেয়ারম্যান ক্লস সয়েব বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনেই লিঙ্গ সমতা অর্জন করা জরুরি। সেসব দেশই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে পারবে যেসব দেশে নারী-পুরুষ মিলিয়ে সব মেধাবীরাই অর্থনীতিতে অবদান রাখার সমান সুযোগ পাবে। তালিকায় তলানিতে রয়েছে ইয়েমেন, পাকিস্তান এবং চাদ।

এ বছরের সূচকে ১১৪তম স্থানে এসেছে ভারত। যদিও গত বছর এ দেশটির অবস্থান ছিল ১০১তম। প্রতিবেদনে বলা হয়, কয়েক বছরে অর্থনৈতিক গতি এলেও এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকে শুরু করে শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হতে হয় ভারতের নারীদের। তালিকায় চীনের অবস্থান ৮৭তম এবং ব্রাজিলের অবস্থান ৭১তম। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে এ তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ফিনল্যাণ্ড। এ দেশটির অবস্থানে নবম।

ডাব্লিউইএফের মতে, তাদের গত ৯ বছরের মূল্যায়নে দেখা গেছে, বিশ্বজুড়ে, লিঙ্গবৈষম্য, সামান্যই কমেছে কর্মক্ষেত্রে। ২০০৬ সালে যেখানে অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন সুযোগ ছিল ৫৬ শতাংশ, বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৬০ শতাংশ। সংস্থার মতে, বিশ্বব্যাপী এ ব্যবধান পূর্ণভাবে কমিয়ে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা করতে অন্তত ৮১ বছর সময় লাগবে।

কালের কণ্ঠ ২৯.১০.২০১৪

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও অর্থায়ন বিষয়ক কর্মশালা

এডভোকেসির অংশ হিসেবে ব্র্যাক অডিটোরিয়াম, ব্র্যাক সেন্টারে গণসাক্ষরতা অভিযান, ব্র্যাক ও আইআইডি-

এর যৌথ উদ্যোগে ২০-২২ অক্টোবর ২০১৪ প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ, সমতা ও মান উন্নয়ন; শিক্ষায় অর্থায়ন বিষয়ক তিনটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তার সমাধানের জন্য একটি পথরেখা তৈরি করা। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে একটি কর্মপত্র চূড়ান্ত করে তা জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে এই এডভোকেসি ক্যাম্পাইনের সূচনা করা হবে।

কর্মশালায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী এবং বিইউআইইডি-র সিনিয়র এডভাইজর ড. মনজুর আহমদ। এছাড়া ব্র্যাক-এর সিনিয়র পরিচালক আসিফ সালেহ, গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক, আইআইডি-র প্রধান নির্বাহী সাঈদ আহমেদ, ব্র্যাক-এর শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক শফিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, প্রধান সমন্বয়ক, জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট, অধ্যাপক মাহমুদুল আলম, নর্দান ইউনিভার্সিটি, শহিদুল আলম কর্মসূচি কর্মকর্তা- ইউনেস্কো, ড. গোলাম মোস্তফা, ইসিডি এডভাইজর, আগা খাঁন ফাউন্ডেশন, তালাত মাহমুদ, কর্মসূচি পরিচালক, সেভ দ্য চিলড্রেন উল্লিখিত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরের পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, অভিযান কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, এডুকেশন ওয়াচ দলের সদস্যবৃন্দ, সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, শিক্ষক সংগঠন এবং আয়োজক সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাসহ শতাধিক প্রতিনিধি এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

সামছুন নাহার কলি

এডুকেশন ওয়াচ ২০১৩-এর সহজবোধ্য বাংলা সংস্করণ-এর খসড়া উপস্থাপন সভা

২২ ও ২৩ অক্টোবর ২০১৪ নাটোর ও দিনাজপুর জেলায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও আলো, নাটোর এবং গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে, দিনাজপুর-এর যৌথ উদ্যোগে User Friendly Version of Education Watch Report 2013-এর ওপর একটি অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নাটোরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আলো-র আয়োজনে অবহিতকরণ সভা ২২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সুবোধ কুমার মৈত্র (অলোক মৈত্র)। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মো. দেলোয়ার হোসেন, বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নফীসা বেগম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নাটোর। নির্ধারিত আলোচক হিসাবে আলোচনা করেন নাটোর-এর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সাবরিনা আনাম।

২৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র-এর প্রধান নির্বাহী মোয়াজ্জেম হোসন-এর সভাপতিত্বে দিনাজপুর, ঘাসিপাড়া পরিবার পরিকল্পনা সমিতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর-এর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর আহমেদ হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তকর্তা মো. একরামুল হক। এডুকেশন ওয়াচ সমীক্ষার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মো. আব্দুর রউফ।

সভায় সহজবোধ্য বাংলা ভাষ্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইংরেজি বিভাগ-এর অধ্যাপক শফি আহমেদ। তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে সরকার যথেষ্ট সচেতন ও আন্তরিক রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে হলে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি শুধুমাত্র পরীক্ষায় ভাল করে সনদপত্র অর্জনের মনোভাব থেকে সরে আসার জন্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আহ্বান জানান।

মো. আব্দুর রউফ

প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

২২ ও ২৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক ফলোআপ ওরিয়েন্টেশন-এর দুইটি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওরিয়েন্টেশন কোর্স দুইটি উদ্বোধন

করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ। তিনি বলেন, সকলের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শিশুদের জন্য আনন্দমুখর বিদ্যালয়ের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। সে জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, এসএমসি, অভিভাবক সকলকে সচেতন হতে হবে। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উদ্যোগে এর আগে চার দিনব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক বেসিক ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করা হয়েছিল। ওরিয়েন্টেশনের কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা এবং স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সুশাসন নিশ্চিত করতে আরো কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করাই এই ওরিয়েন্টেশনের উদ্দেশ্য।

উক্ত ওরিয়েন্টেশন কোর্সসমূহে গণসাক্ষরতা অভিযানের সদস্য ও সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধি, কমিউনিটি

ওয়াচ এলাকার সদস্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যসহ মোট ২৫ জন করে মোট ৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কোর্স দুটি পরিচালনায় সহায়ক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন সাকিবা খাতুন, উর্ধ্বতন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক। কোর্স দুটি আয়োজন করেন তাজমুন নাহার, সহকারী কার্যক্রম কর্মকর্তা গণসাক্ষরতা অভিযান।

তাজমুন নাহার

বাংলাদেশ গার্লস সামিট ২০১৪-এ গণসাক্ষরতা অভিযানের অংশগ্রহণ

বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং কন্যাশিশুর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে ২৭ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ওসমানী মেমোরিয়াল অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ গার্লস সামিট ২০১৪-এর আয়োজন করা হয়।

উন্নয়ন সহযোগী ডিএফআইইডি-এর আর্থিক সহায়তায় ব্র্যাক এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এই সামিটের আয়োজন করে। বাংলাদেশে শিক্ষা নিয়ে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং সিভিল সোসাইটির ঐক্যজোট গণসাক্ষরতা অভিযান উক্ত সামিটে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং বাল্যবিবাহ বন্ধের দাবিতে কিশোরীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজারেরও বেশি কিশোরী এই সামিটে অংশগ্রহণ করে। সামিটে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিস্ লেনি ফেদারস্টোন, ইউকে পার্লামেন্ট সদস্য (The Right Honourable Lynne Featherstone MP, UK Parliamentary Under Secretary of State for International Development.), এবং সামিটে সভাপতিত্ব করেন স্যার ফজলে হাসান আবেদ, কেসিএমজি, প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারপারসন ব্র্যাক। এছাড়া রাশেদা কে চৌধূরী, নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান এবং প্রখ্যাত লেখক সেলিনা হোসেন, সামিটে কিশোরীদের বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

গণসাক্ষরতা অভিযান সামিটে আয়োজিত মেলাতেও অংশগ্রহণ করে। মেলায় অভিযান কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শন করা হয় এবং বেশ কিছু উপকরণ সবার মাঝে বিতরণও করা হয়।

ফারদানা আলম সোমা

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

গণসাক্ষরতা অভিযান সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রমের পাশাপাশি মানসম্পন্ন প্রথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণ, বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াসহ সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসমএসি, পিটিএ, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দসহ শিক্ষক ও স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসু শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করাই এ সকল উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য।

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক পরিচালিত প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় জামালপুর ও নেত্রকোনা জেলায় অক্টোবর ২০১৪-এ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের করণীয় শীর্ষক ৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান ও সহযোগী সংস্থা সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন, নেত্রকোনা এবং আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, জামালপুর-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত কর্মশালা সমূহে শিক্ষক, এসএমসি-র সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ মোট ১১৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাসমূহে অধিবেশন পরিচালনা করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। গণসাক্ষরতা অভিযান থেকে উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক জামিল মুস্তাক কোর্স সমন্বয়কারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

জামিল মুস্তাক

আঞ্চলিক মতবিনিময় সভা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১

২৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর আর্থিক সহায়তায় একশন ইন ডেভেলপমেন্ট (এইড), ঝিনাইদহ ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে এইড কমপ্লেক্স, ঝিনাইদহ-এ অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ শীর্ষক আঞ্চলিক মতবিনিময় সভা। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. শফিকুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ। বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. মনির হোসেন, অধ্যক্ষ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদহ ও শেখ মো. সুরুজ্জামান, সহকারি পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ বিষয়ক মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন ইঞ্জিনিয়ার এস এম তরিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ঝিনাইদহ। সভায় সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, প্রাইভেট দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ ৮০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪৫ জন নারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ।

মো. মিজানুর রহমান আখন্দ, উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, গণসাক্ষরতা অভিযান সভা আয়োজনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন।

প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, কারিগরি প্রশিক্ষণ দিতে হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী। কারিগরি দক্ষতার প্রয়োগ ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে সবার সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

মিজানুর রহমান আখন্দ

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৪৫ কার্তিক ১৪২১ অক্টোবর ২০১৪

সম্পাদক

বনযাত্রার মৌলিক বিষয়সমূহ যেমন, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাস ও কর্মসংস্থান বিষয়ে বিভিন্ন রকমের ঘাটতি নিয়ে আমাদের দেশে প্রতিদিনই আলোচনাসভা ও পর্যালোচনা কথকতার সংবাদ আমরা পেয়ে যাই। তাতে পরিস্থিতির ওপর যে অভিঘাত পড়ে, সেই প্রতিক্রিয়ার সুফলও কিছু ঘটে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশেষত, শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশে যতরকমের কথাবার্তা, তর্কবিতর্ক, কর্ম-শিবির, বৈঠক, দেন-দরবার, স্মারকলিপি প্রদান, মিছিল, কর্মবিরতি এমনকি শহীদ মিনারে অনশনের যত ফিরিস্তির কর্মসূচি পালিত হয়, তার তুলনা বিশ্বের খুব কম দেশেই মিলবে বলে আমাদের ধারণা।

শিক্ষা বিষয়ে সাম্প্রতিক কালে আমাদের সাফল্যরেখা ক্রমাগত ঊর্ধমুখী, এ নিয়ে মতান্তর নেই, তবে সব অর্জনের তালিকার পরও বেশ যুক্তিসঙ্গতভাবেই একটা 'কিন্তু....' দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যত সব সুবিধা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বই-পত্র, উপকরণ প্রভৃতির কথা বলি না কেন, শিক্ষা নামক জ্ঞানচর্চার বিষয়টার প্রধান নিয়ামক যে শিক্ষক, সে নিয়ে কেউ তো বিরোধিতায় নামতে পারবেন না।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

সাধারণভাবে একটা কথা বলা যায় যে, আমাদের সমাজে শিক্ষকরা ভাল নেই, তারা অর্থাভাবে ভোগেন, সামাজিক মর্যাদায় তারা নিজেদের অন্যদের চেয়ে কিছুটা খাটো ভাবেন। বিপরীত চিত্রও আছে, মাস্টারমশাইরা প্রাইভেট পড়ানোর জন্য ঢাকায় একাধিক ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে শিক্ষাব্যবসা চালান। শিক্ষকবৃন্দ তাদের অবস্থার উন্নয়নে নিজেদের চাকুরি সরকারিকরণ করতে চেয়েছেন। আবার দেখা গেছে, সরকারিকরণের পর তাদের মধ্যে যে ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের প্রদর্শন প্রত্যাশিত ছিল তা ঘটেনি। শিক্ষকরা পরীক্ষার নকল করার সাহায্য করছেন, নিজে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করছেন এমনকি মাদ্রাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বহু শিক্ষকের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। বিপরীত দিক থেকে বলা যায়, অসংখ্য সৎ, শিক্ষানুরাগী ও পরিশ্রমী শিক্ষক আছেন বলেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সচল আছে, সমাজে তার সুফল দেখা যাচ্ছে। অক্টোবর মাসে শিক্ষক দিবস পালনের সময় শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার সমান্তরালে তারা শিক্ষাজগতকে উন্নত, দক্ষ ও কলুষমুক্ত করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে পারেন, সে বিষয়েও তাদের সম্মিলিত অঙ্গীকার করতে হবে।

সমকালে একটি সংবাদ আমাদের বিশেষভাবে আনন্দে আপ্লুত করেছে। ২০১৪ সালে ভারতের নিবেদিতপ্রাণ শিশু অধিকারকর্মী কৈলাস সত্যার্থী এবং শিশুশিক্ষা বিস্তারে অকুতোভয় কর্মী পাকিস্তানের কিশোরী মালালা ইউসুফজাই যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাঁদের এই বিশাল স্বীকৃতি উন্নয়নকর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণার অনিঃশেষ উৎস। এই দুই অজেয় ব্যক্তিকে জানাই অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

২০১৪ সালে বিশ্বজুড়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার উইলিয়ম শেকস্‌পীয়রের ৪৫০-তম জন্মবার্ষিকী। তাঁকে স্মরণ করে *বুলেটিন*-এর পাঠকদের জন্য একটা ছোট রচনা গ্রন্থিত হল।

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন:৫৮১৫৩৪১৭, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৪৫ কার্তিক ১৪২১ অক্টোবর ২০১৪

সম্পাদক

বনযাত্রার মৌলিক বিষয়সমূহ যেমন, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাস ও কর্মসংস্থান বিষয়ে বিভিন্ন রকমের ঘাটতি নিয়ে আমাদের দেশে প্রতিদিনই আলোচনাসভা ও পর্যালোচনা কথকতার সংবাদ আমরা পেয়ে যাই। তাতে পরিস্থিতির ওপর যে অভিঘাত পড়ে, সেই প্রতিক্রিয়ার সুফলও কিছু ঘটে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশেষত, শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশে যতরকমের কথাবার্তা, তর্কবিতর্ক, কর্ম-শিবির, বৈঠক, দেন-দরবার, স্মারকলিপি প্রদান, মিছিল, কর্মবিরতি এমনকি শহীদ মিনারে অনশনের যত ফিরিস্তির কর্মসূচি পালিত হয়, তার তুলনা বিশ্বের খুব কম দেশেই মিলবে বলে আমাদের ধারণা।

শিক্ষা বিষয়ে সাম্প্রতিক কালে আমাদের সাফল্যরেখা ক্রমাগত ঊর্ধমুখী, এ নিয়ে মতান্তর নেই, তবে সব অর্জনের তালিকার পরও বেশ যুক্তিসঙ্গতভাবেই একটা 'কিন্তু....' দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যত সব সুবিধা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বই-পত্র, উপকরণ প্রভৃতির কথা বলি না কেন, শিক্ষা নামক জ্ঞানচর্চার বিষয়টার প্রধান নিয়ামক যে শিক্ষক, সে নিয়ে কেউ তো বিরোধিতায় নামতে পারবেন না।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

সাধারণভাবে একটা কথা বলা যায় যে, আমাদের সমাজে শিক্ষকরা ভাল নেই, তারা অর্থাভাবে ভোগেন, সামাজিক মর্যাদায় তারা নিজেদের অন্যদের চেয়ে কিছুটা খাটো ভাবেন। বিপরীত চিত্রও আছে, মাস্টারমশাইরা প্রাইভেট পড়ানোর জন্য ঢাকায় একাধিক ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে শিক্ষাব্যবসা চালান। শিক্ষকবৃন্দ তাদের অবস্থার উন্নয়নে নিজেদের চাকুরি সরকারিকরণ করতে চেয়েছেন। আবার দেখা গেছে, সরকারিকরণের পর তাদের মধ্যে যে ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের প্রদর্শন প্রত্যাশিত ছিল তা ঘটেনি। শিক্ষকরা পরীক্ষার নকল করার সাহায্য করছেন, নিজে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করছেন এমনকি মাদ্রাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বহু শিক্ষকের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। বিপরীত দিক থেকে বলা যায়, অসংখ্য সৎ, শিক্ষানুরাগী ও পরিশ্রমী শিক্ষক আছেন বলেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সচল আছে, সমাজে তার সুফল দেখা যাচ্ছে। অক্টোবর মাসে শিক্ষক দিবস পালনের সময় শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার সমান্তরালে তারা শিক্ষাজগতকে উন্নত, দক্ষ ও কলুষমুক্ত করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে পারেন, সে বিষয়েও তাদের সম্মিলিত অঙ্গীকার করতে হবে।

সমকালে একটি সংবাদ আমাদের বিশেষভাবে আনন্দে আপ্লুত করেছে। ২০১৪ সালে ভারতের নিবেদিতপ্রাণ শিশু অধিকারকর্মী কৈলাস সত্যার্থী এবং শিশুশিক্ষা বিস্তারে অকুতোভয় কর্মী পাকিস্তানের কিশোরী মালালা ইউসুফজাই যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাঁদের এই বিশাল স্বীকৃতি উন্নয়নকর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণার অনিঃশেষ উৎস। এই দুই অজেয় ব্যক্তিকে জানাই অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

২০১৪ সালে বিশ্বজুড়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার উইলিয়ম শেকস্‌পীয়রের ৪৫০-তম জন্মবার্ষিকী। তাঁকে স্মরণ করে *বুলেটিন*-এর পাঠকদের জন্য একটা ছোট রচনা গ্রন্থিত হল।

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন:৫৮১৫৩৪১৭, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org